জ্বলন্ত তলোয়ার

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গৌড়মল্লার

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে "FLAMING SWORD" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। একটি মাত্র কথায় সুভাষ-জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস এমন ভাবে কোথাও কখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সেজন্য এই পুস্তকের নামকরণ করা হইল "জ্বলন্ত তলোয়ার"। জয়হিন্দ!

গ্রন্থকার

"তুমি তো আমাদের মত সাধারণ মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ— তাইত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়! তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত—তোমাকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়!—কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার? এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পার বলিয়াই ত ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তি পথের অগ্রদূত, হে পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী, তোমাকে শতকোটি নমস্কার!"

—শরৎচন্দ্র

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)

করকমলেষু—

তুমি যে বেসেছ ভাল
আত্মভোলা সন্ন্যাসী স্বভাবে,
তাই ত তোমারে ভালবাসি ;
ভালবাসি অগ্নি-দীপ্ত প্রশস্তি তোমার
মহাজাতি নিয়ামক নেতাজির প্রতি ;
ছন্দের বন্ধনে তারে পূজিয়াছ কবি,
সুন্দর ও ভয়ঙ্করে সঙ্গীতের সুরে
রূপায়িত করিয়াছ অন্তরের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে।

পূর্ব্ব এশিয়ার ঘন রবারের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে
ব্রহ্মদেশ-সীমান্তের আদিগন্ত সেগুনের বনে
নদীতীরে পথে ও প্রান্তরে
মৃত্যুপণে জেগেছিল আহ্বান যাহার ;
অগ্নি-রথে আবির্ভাব তার
কবে হবে জানিনাক,
তবে শুধু এই মাত্র জানি—
ইম্ফালে থামেনি যাত্রা
সে কেবল সংগ্রামের প্রথম প্রস্তুতি ;
তারি মাঝে স্তব্ধ আছে এ মহাজাতির ইতিহাস ;
শেষ অধ্যায়ের কথা
কে লিখিবে তাও জানিনাক।

আমার এ ছন্দে নাই সে দীপ্ত ঝঙ্কার
আছে শুধু বৈরাগ্যের ভৈরবী রাগিনী,
গৈরিক জ্বালায় জ্বলে অন্তরের অনন্ত প্রত্যাশা।
হৃদয়-শোণিতে রাঙা ফুল দিয়া সাজায়েছি বেদী
রাঙা রাখী দিব হাতে যদি দেখা হয় শুভক্ষণে।

রজনীগন্ধার বনে ফুলের উৎসব নহে তা'র
জ্যোৎস্নার জোয়ার নহে, সে চেয়েছে রাত্রির আঁধার
যে গান সে ভালবাসে, সে গানে বিদ্যুৎবহ্নি ছোটে
মেঘের ডম্বরু বাজে যে ছন্দে সে তাই ভালবাসে।
তুমি সেই রুদ্র ছন্দে অগ্নি-দীপ্ত সুরের আলোকে
রচিয়াছ প্রশস্তি তাহার ;
তাই ত তোমারে বলি—
হে বন্ধু, দাঁড়াও কাছে মোর
দেখ ত আমার কণ্ঠে সেই সুর বাজে কিনা বাজে,
আমার ছন্দের মেঘে আছে কিনা আগ্নেয় প্রস্তুতি।

মর্ম্মকোষ-নিষ্কাশিত আমার "জ্বলন্ত তলোয়ার"
কেন তব হাতে দিই ?
—তুমি যাহা ভালবাস
সেই তব যোগ্য উপহার ?

"স্বপ্ন-সায়র"
১৬ বিপিন পাল রোড্
কলিকাতা ২৬
২৩শে জানুয়ারী, '৫০

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

—সূচি—

জ্বলন্ত তলোয়ার

বাঁকা বিদ্যুত বিদীর্ণ মেঘে মেঘে
ঝলসি উঠিছে দিগ্‌-দিগন্ত ঘেরি'
সেই দুর্যোগে ঘন ঘন ফুৎকারে
কাহার কণ্ঠে নিনাদিত রণভেরী ?
তারি সাথে সাথে দূরে,—অদৃশ্য হ'তে
চমকিয়া ওঠে জ্বলন্ত তলোয়ার,
শত্রু-জাঙ্গাল এখনি ভাঙ্গিবে বুঝি
দুর্মদ বেগে ছুটে চলে আসোয়ার।

ঘন অরণ্য গিরি-গুহাতল ব্যাপি'
মুক্তি-সেনার আনন্দ-কোলাহলে
পথের দু'ধারে গৃহ-দ্বার যায় খুলে
নরনারী শিশু ছুটে আসে দলে দলে।
কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিত লক্ষ সেনা
তুলিল শঙ্কাহরণ জয়-ধ্বনি,
মুক্তি-সাধন জীবন-মরণ পণে
লুটায় জীবন পরম ভাগ্য গণি'।

চলে পায়ে পায়ে আনন্দে গান গাহি'
জীবনে জীবনে উচ্ছল প্রাণধারা,
দৃঢ় হস্তের নির্ম্মম অভিঘাতে
এবার ভাঙ্গিব রুদ্ধ পাষাণ-কারা।
শিরায় শিরায় রক্তের দোলা লাগে
অধীর আবেগে চঞ্চল তার গতি,
নয়নে নয়নে মৃত্যুর লাল নেশা
জাগিল অযুত লক্ষ অভয়-ব্রতী।

জাগিল হেথায় মুক্তির ঝনঝনা
বন্দীশালার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে,
হোথা চলে তারি মরণ-মহোৎসব
অজ্ঞাত পথে, পর্বতে জঙ্গলে।
হেথায় জননী সন্তানে ডাকি' ব'লে
—"ঘরে ফিরে আয়, ওরে মোর অভিমানী"
রণ-উল্লাস ছাপাইয়া মাঝে মাঝে
হোথা ওঠে তার মধুর কণ্ঠে বাণী :—

"দূরে বহু দূরে সিন্ধুর পরপারে
নদ-নদী বন ভূখণ্ড ছাড়াইয়া
লঙ্ঘিয়া শত পর্ব্বত, সম্মুখে
মা আমার আছে দুই বাহু বাড়াইয়া;
আমার জননী আমার জন্মভূমি
সকল স্বর্গ হতে তুমি গরীয়সী,
মম যৌবন-নিকুঞ্জ তব বনে
তোমার মাটিতে মৃত্যুর বারাণসী।

আত্মীয় আজ ডাকিছে আকুল হয়ে
ডাকে রাজপথ, ডাকিতেছে রাজধানী,
রক্তের টানে রক্ত নাচিয়া ওঠে
অন্তরে শুনি মা'র আহ্বান-বাণী।
সম্মুখে রয়েছে সুদীর্ঘ ওই পথ
সে পথ রচিত বহু শহীদের খুনে
সে পথের ধূলি চির পবিত্র আজি
মাতৃপূজার অমোঘ মন্ত্র-গুণে।"

হাজারে হাজার সৈনিক চলে আগে
মুক্তির পথ সঙ্কট ক্ষুরধার,
জানো কি তাদের পথের দিশারী হয়ে
সম্মুখে ছিল জ্বলন্ত তলোয়ার ?
তাহারি আলোকে এখনও আকাশ জ্বলে
এখনও পৃথিবী তাহারে করিছে নতি,
বাঁকা বিদ্যুতে ঘসা সুতীক্ষ্ণ ধার
ঘোর দুর্যোগে দুর্জ্জয় তার গতি।

থামেনি থামেনি এখনও থামেনি তা'র
জয়-যাত্রার অপূর্ব অভিযান,
বন্ধ হয়নি প্রহরে প্রহরে পূজা
মা'র মন্দিরে সহস্র বলিদান।
এখনও পূজার থালি ভ'রে আছে ফুলে,
আছে চন্দন, আছে ধূপ-দীপ জ্বালা,
অভয়-মন্ত্রী সন্ন্যাসী জপিতেছে
অরণ্যে বসি' রুদ্রাক্ষের মালা।

জ্বলন্ত তলোয়ার

যদিও রাত্রি আঁধারে ভয়ঙ্করী,
তবুও রাত্রি এখনি প্রভাত হবে,
তিমির বিদারি' উষার আলোকছটা
দিগ্-দিগন্তে কেন দেখা যায় তবে ?

শেষ আহুতির লগ্ন যায়নি বয়ে
তপস্যারত যোগাসনে কাপালিক,
স্পর্শ তাহার পাই যে বুকের মাঝে
তাহারি মন্ত্রে মুখরিত চারিদিক।
আকাশে বাতাসে তারি আহ্বান জাগে,
সূর্য্যকিরণে জ্বলন্ত তলোয়ার
ঝলসি' উঠিবে আবার আচম্বিতে
দুর্গম পথে যাত্রীরা হুসিয়ার।

রাজবন্দী

বন্দি তোমা রাজবন্দী আজ,
তুমি যে দিয়েছ লাজ
স্পর্শমাত্রে বন্ধনের কঠিন শৃঙ্খলে
গ্রন্থি তার দেখি দলে দলে
ফুল হয়ে ফুটিয়াছে সৌন্দর্য্যের আনন্দ-সম্ভার,
জীর্ণ লৌহ-খণ্ড গুলি তার
ধূলিম্লান লুটিতেছে পদতলে তব।
চেয়ে দেখি অভিনব,—
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর
ধূলিসাৎ হতে চায় বেদনায় বিদীর্ণ অধীর!
কারার অর্গল গুলি
অনর্গল যায় খুলি
তব করস্পর্শে আজ, হে মায়াবী, এ কি যাদুজাল!
তিষ্ঠ ক্ষণ কাল,
দেখি মোরা ভাল ক'রে অন্ধ দৃষ্টি চিনে না আপন
মমতায় দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে মায়ার স্বপন।
তোমার বন্ধন
বল-দর্প-অগ্নি-কুণ্ডে পতনের জোগায় ইন্ধন।
শস্ত্রপাণি হয়ে যারা নিরস্ত্রেরে করিছে প্রহার
এ'ত নহে শেষ তার;

জলন্ত তলোয়ার

চরণে দলিছে যারা অসহায় নিরাশ্রয় প্রাণী,
বাড়াইয়া আপনার গ্লানি
পশু-বলে আজি যারা স্ফীতবক্ষ হয়ে
অকারণে অসময়ে
মানুষের করে অপমান,
হবে হবে অবসান
তাঁদের এ নরমেধ-যজ্ঞ একদিন ;
কুলিশ কঠিন
বিধাতার ভীম দণ্ড নামিয়া আসিবে আচম্বিতে ;
চতুর্ভিতে
অবিচারী অনাচারী মুহূর্ত্তেকে ত্যজিবে নিশ্চয়
গর্ব্বোদ্ধত অস্ত্র সমুদয় ;
এত নহে নিন্দা অপবাদ
তোমার বন্ধন সে যে আসন্ন মুক্তির সুসংবাদ ।

হে কর্ম্ম-কুশল,
তুমিই ভাঙিবে জানি ভারতের দাসত্ব-শৃঙ্খল ;
দেশ-দেবতার তরে রচিয়াছ যে অর্ঘ্যমালিকা
দুর্ভাগা দেশের সে যে সৌভাগ্যের লিখা !
সে পবিত্র নিবেদন
অমৃত-গরলে ভরা বুকফাটা গভীর বেদন ।
ত্যাগী তুমি সত্যসন্ধ বলী
শত স্বার্থ-স্বর্ণ-খণ্ডে অবহেলে গেছ পায়ে দলি'
বিত্ত মাঝে চিত্ত তব স্থির
সাধনায় প্রশান্ত গম্ভীর ;

তোমার সুকৃতি মাঝে দ্বন্দ্ব ত্যজি' কমলা ভারতী
লভিছেন পূজার আরতি।
লোকে লোকে বিস্তারিয়া সেই সে জীবন
করিতেছ দুঃসাধ্য সাধন।
ক'দিনই বা এসেছ ধরায়
জীবন সার্থক গণ্য নহে কভু দণ্ড পল ঘায়।
দীর্ঘ পরমায়ু করি ক্ষয়
জীবন নিষ্ফল যদি ভোগসুখে আত্মার বিলয়
সে ত বৃথা জন্ম নিল এ ধরায় আসি
স্রোতে ভেসে এসেছিল, পুনরায় স্রোতে গেল ভাসি।

বন্দি তোমা দৃঢ়চিত্ত বীর
সমুন্নত তব শির,
বিস্তৃত ললাটে তব সূর্য্য-প্রভা সদা দীপ্যমান
তুমি জ্যোতিষ্মান।
কালো হোল ঈষাণে আকাশ
ধরিত্রী ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
ঝড় এলো ঝড় গেল—ধারা বৃষ্টি নামিল মাথায়
সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ; সহস্রের বন্ধন-ব্যথায়
অবিরাম চলিয়াছ হে পথিক যৌবন-উচ্ছল,
মায়ের মন্দির-চূড়া, সেই দিকে দৃষ্টি অচঞ্চল !
হে তরুণ, হে পথের সাথী
তোমারে হেরিলে ভাবি পোহায়েছে দুর্য্যোগের রাতি,
তোমার মুখের ভাষা, হে সুভাষ, কান পেতে শুনি
কল্পনার কত জাল বুনি ;

তোমার অম্লান হাসি নবস্তৃষ্টি অনুরাগে ভরা
কর্ম্মপথে ক্লান্তি দূর করা।

বজ্রাধিক সুকঠোর কুসুম হইতে মৃদু হিয়া
স্নেহ প্রেম করুণা সঞ্চিয়া
মধুময় করিয়াছ বঞ্চিতের বিশুষ্ক পরাণি
দরিদ্রের দুঃখ গ্লানি,
আর্ত্তস্বরে অনাথ আতুর
করুণায় চিত্ত তব রাখিয়াছে সদা ব্যথাতুর।
তারা আজ আনন্দে বিহ্বল
ঘর ছাড়া যৌবন-চঞ্চল
বাহিরিয়া আসে ছুটে ;
বসন্ত আনন্দ-লিপি লিখে যায় নবপত্রপুটে।

সে যৌবন-অভিযাত্রা, সংগ্রামের তুমিই সারথী,
তোমার আরতি
হবেনাক মন্ত্র পড়ি' নাচাইয়া বরণের ডালা,
সভামঞ্চে গন্ধ-দীপ জ্বালা
সে তোমার তরে নহে ;
তুমি চাহ একান্ত আগ্রহে
যৌবন-জোয়ারে ভাসা লক্ষ শত রক্ত শতদল
তাই দিয়ে সাজাইবে জননীর চরণ-কমল।

হে অজয়
সম্মুখে বিস্তৃত পথ, তরুণের শতেক সংশয়,
সহস্র সঙ্কট
অন্ধকার গিরিগুহা, বিষধর প্রচ্ছন্ন কপট ;
মায়ার কাঁদন
পদে পদে বাধা দেয় দূর হয় অসাধ্য সাধন
চতুর্দ্দিকে তার
অপদেবতার ছায়া, অট্টহাসি বিকট চিৎকার।
তুমি শুধু দাঁড়াও সম্মুখে,
তব দীপালোক হ'তে আশাহীন অন্ধকার বুকে
কর তুমি আলোক সঞ্চার ;
বার বার
যে দীপ নিবিতে চায় যাত্রা-পথ অন্ধকার করি
তাহার প্রদীপ্ত শিখা তুমি আজ ঊর্দ্ধে রাখো ধরি।

প্রথম কারাবাস হইতে মুক্তি লাভের পর কলিকাতা বিদ্যাপীঠে কিরণশঙ্কর রায়ের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত অভিনন্দন-সভায় পঠিত। ১৯২২, আশ্বিন, ১৩২৯।

মুক্তি-বরণ

কোথায় বন্ধু, কোথায় তোমারে বরণ করি
এ আঁধারে কোথা আরতির দীপ জ্বালায়ে ধরি ?
দেশের বিরাট বন্দীশালায়
ক্ষোভে অপমানে তীব্র জ্বালায়
শত বন্ধনে ক্রন্দন ওঠে জীবন ভরি ;
তোমার শঙ্খ কেঁপে ওঠে হাতে সরমে মরি।

রক্তজবার বরণ-মালিকা কোথায় রাখি
প্রহরী দাঁড়ায়ে ভয় হয় মনে কি বলে ডাকি,
হাতে পায়ে বাঁধা লোহার শিকল
চিরবন্দীরে করিছে বিকল
কঠিন প্রাকার ঘিরি চারি ধার রাঙায়ে আঁখি
অনুরাগে রাঙা নয়নে অশ্রু শুকাবে নাকি ?

কোন্ খানে ওগো কোন্ খানে করি পূজার ঠাঁই
দর্পিত বলে মাটি কাঁপে, তোমা কোথা বসাই ?
কোটি কোটি প্রাণী আপনার ঘরে
বন্ধ দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরে
জন্ম-ভূমির এতটুকু ভূমি নিজের নাই
তীর্থক্ষেত্রে মিলে না ঠাকুর পূজার ঠাঁই।

বন্দীরে আজ কিসে বন্দনা করিবে কবি
রক্ত-সন্ধ্যা নিবাল দিনের উজল রবি,
শাসনদণ্ডে বাণী তার মূক
অপমান-ভয়ে লেখনী বিমুখ
রক্তরেখায় ফুঠে ওঠে শুধু প্রেতের ছবি,
হে রাজবন্দী,—কি গান গাহিবে দেশের কবি ?

আপনার দেশে স্বদেশী স্বজন নির্ব্বাসিত
আপনারই ছায়া হেরি' বিহ্বল মরণ-ভীত ;
পথে ঘাটে মাঠে বন্দীর দল
বুকে হাতে রাখি ফেলে আঁখিজল
গৃহদীপখানি দশাহীন আজ নির্ব্বাপিত ;
কারাগার হতে তুমি আজ দেশে নির্ব্বাসিত।

নির্ব্বাসনের আসনে তোমায় কেমনে ডাকি
অভিষেক কার প্রাণের বেদনা গোপনে রাখি,
দাস-জীবনের কলঙ্ক-কথা
গ্লানি লাঞ্ছনা বন্ধন-ব্যথা
তোমার অর্ঘ্যফুল হয়ে ফোটে শোণিত মাখি
এ নিঠুর পূজা গ্রহণে হৃদয় ছিঁড়িবেনা কি ?

অন্তরে তুমি রয়েছ মুক্ত আপন বলে
নয়নে তোমার মুক্তি-পূজার অনল জ্বলে,
অবনত দেশে উন্নত শির
ব্যথার পূজারী নির্ভীক বীর

জলন্ত তলোয়ার

তুমি যে মুক্ত, বিজয়-মাল্য তোমার গলে
অপমান তব কেমনে করিব পূজার ছলে ?

কঠিন নিগড়ে বন্দী যাহারা আপন ঘরে
কেমনে তাহারা তোমার বন্ধু, বরণ করে ?
দিবস-রাত্রি আর্ত্ত রোদন
করে ধ্বংসের অকাল বোধন,
তোমার বিজয়যাত্রার পথে নিশান ধরে'
তারা যে কেবল বাড়াবে লজ্জা গর্ব্বভরে !

আজিকে দাসের ভবনে ভুবনে মিথ্যা মায়া
অবিরাম ফেলে সর্ব্বনাশা এ প্রেতের ছায়া,
জীবন্ত লয়ে আজি এ শ্মশান
মৃত-যাগে করে নিশা অবসান
আপনারে শুধু বঞ্চনা করে, নাহিক হায়া
যেন প্রাণবায়ু নিঃশেষ, শুধু জাগিছে কায়া।

ছায়া দোলে আর মনের দোলায় মরণ দোলে
মরীচিকা হাসে মৃত্যুর হাসি মরুভূ কোলে,
দেবতা দৈত্যে বাধিয়াছে রণ,
প্রলয়সিন্ধু করি আলোড়ন
কি জানি কখন অমৃত ফেলিয়া গরল তোলে
ধূমকেতু ওই মেলিছে পুচ্ছ মেঘের কোলে।

শব পড়ে আছে মহাশ্মশানের বক্ষ 'পরে
শকুনি উড়িছে প্রাণীহীন দেহ লক্ষ্য ক'রে
অদৃশ্য হ'তে ওঠে হাহাকার
আঁধার নামিছে এপার ওপার
শ্রাবণের শেষ নিশি-দুর্য্যোগ তোমার তরে
শবাসন তাই রচিল বিধাতা আপন করে।

গগনে পবনে বনে বনে আর দাসের মনে
শোধনবহ্নি উঠুক জ্বলিয়া পরম ক্ষণে,
মৃতের অস্থি দহন জ্বালায়
জাগিয়া উঠুক বন্দীশালায়
বাজাও তোমার হাতের শঙ্খ গভীর স্বনে
শ্মশানের শব উঠিয়া দাঁড়াবে সঞ্জীবনে।

ধিকি ধিকি জ্বলে শ্মশানবহ্নি, তাল বেতাল
ডম্বরু বাজে, বাজে ঘন ঘন নরকপাল,
এই শ্মশানের যোগাসন 'পরে
তোমারে বসাই অভিষেক করে'
তোমার কণ্ঠে শবসাধনার মন্ত্রজাল
অগ্নিশিখায় দিক ছেয়ে দিকচক্রবাল।

১৯২৭—১৩ই মে, মান্দালয় জেল হইতে মুক্তি পাইবার পর লিখিত

দুর্য্যোগ রাতে

প্রাণের বন্ধু, এলে দুর্য্যোগ রাতে
রাঙা রাখী তাই পরানু তোমার হাতে ;
হৃদয়-শোণিতে রঙীণ এ রাখী
বুকের আড়ালে লুকাইয়া রাখি
আশাপথ চেয়ে অপলক আঁখি
ভিজে ওঠে বেদনাতে—
কে জানিত হায়, অমাবস্যায়
দেখা হ'বে তোমা সাথে।

কালরাত্রিতে দেখা হ'ল ভাল হ'ল
আঁধারের গায়ে স্মরণ-চিহ্ন র'ল ;
জনহীন পথে তুমি এলে একা
আগুসরি গেছে—কারো পেলে দেখা ?
ফেলে এলে পথে চরণের রেখা
আঁখি দুটি ছলছল—
কাঁটার ব্যথায় ফুটায়ে করবী
সুষমায় ঢল ঢল।

অপরূপ রূপ অনূপ মুখের বাণী
সকল ভুলায়ে পথে আনিয়াছে টানি,

কত বসন্ত মোর আঙিনায়
এল ফিরে গেল দখিণা হাওয়ায়
না ফুটিতে ঝরা ফুলের ব্যথায়
রাঙা উত্তরী খানি
গভীর করেছে বিরহ তোমার
অধীর হয়েছি মানি।

ঝঞ্ঝা-পাগল এল কাল-বৈশাখী
কটা জটাভার কেঁপে ওঠে থাকি থাকি,
মেঘে মেঘে ওঠে গুঢ় ক্রন্দন
দিকবধূ খোলে বেণী-বন্ধন,
সিঁদুর মুছিয়া রাঙা চন্দন
নিশীথিনী দেয় মাখি,
সেই ক্ষণে মোর মনে হ'ল তুমি
এখনি আসিবে নাকি ?

আসনি যে তুমি আলোক-উজ্জ্বল প্রাতে
নিয়ে আসনিক উৎসব-বাঁশী হাতে—
দূরে ছিঁড়ে ফেলে কুসুমের মালা
পায়ে দলে এলে গন্ধের ডালা,
দলিত মনের দুঃসহ জ্বালা
আদরে তুলিয়া মাথে,
তাই ভাল, তাই গর্ব্ব আমার
দুঃখের অমরাতে।

প্রাণের বন্ধু, হৃদয়-বন্ধু মোর
মুক্তি-উষায় হ'বে কি রাত্রি ভোর ?
নিশা জাগে আজও পিশাচের দল
শ্মশান কাঁপায়ে তোলে কোলাহল,
শবাসনে কোথা প্রহর জাগিছ
নাশিতে আঁধার ঘোর,
সাধনার শেষে আসিবে কখন
সেই প্রতীক্ষা মোর।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯২৭

শিবাজী মহারাজ

তুমি বুঝিয়াছ বন্ধু, আহ্বানের এইত সময়
নিদ্রা ভঙ্গে জেগেছে বিস্ময়,
পথভ্রান্ত পেতে চায় দর্শন তোমার ;
মায়ের মন্দির দ্বার
খুলে দাও সম্মুখে সবার।
এতকাল মরু-পথে পদাতিক এসেছিল যারা
ময়-দানবের মন্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন পলাতক তারা ;
প্রভুত্বের অহঙ্কারে তাদের দলিয়া পদতলে
পশ্চিমের শিরস্ত্রাণ মাথায় তুলিয়া যা'রা চলে
স্ফীত বক্ষে উড়ায় পতাকা,
জাতির কলঙ্ক তারা, ইতিহাসে আঁকা
তা'দের দুর্নাম তুমি পার ঘুচাইতে,
তুমি পার শাস্তি দিতে আত্ম-বঞ্চনার
দাস-জীবনের ভ্রান্তি, প্রভু-সেবা-দৃপ্ত অহঙ্কার।

যারা আজ ভীত নিরাশ্রয়
পুরোভাগে দাঁড়াইয়া তাহাদের দাও গো অভয়।
চাহিবে না তাহারা পশ্চাতে
বিস্ময়-বিমুগ্ধ আঁখিপাতে
রুদ্ধঅশ্রু থমকি দাঁড়াবে,
তোমার আহ্বানে তারা মৃত্যুপথে চরণ বাড়াবে।

—পরিবর্ত্তে তা'র
পাবে তুমি আশীর্ব্বাদ দেশ-দেবতার।
ধূলায় লুটায় হেথা, কটিমাত্র চীর-পরিহিত
নহে অভিজাতবংশী, দৈন্য-দোষে সদাই নিন্দিত
লক্ষ প্রাণী অতৃপ্ত ক্ষুধায় ;
নিরন্তর মন্বন্তরে তাহাদের কে বল শুধায় ?
নত শির উচ্চ দেখি যাহারা করেছে অপমান
দুর্ব্বলে দলিয়া পায়ে তারা নিজে ভাবে শক্তিমান
চোখে মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ;
স্বদেশে রয়েছে যারা চির-পরবাসী—
এ নির্ম্মম সত্য তা'রা ভুলিবে কেমনে ?
বন্ধন-ব্যথায় যা'রা জীর্ণ দেহে মনে
প্রতিকারে নিরুপায় সামর্থ্যবিহীন,
অযুত তা'দের কণ্ঠে ওঠে বিষ চিররাত্রিদিন।
আশা, তুমি সেই বিষ পান করি' হইবে অমর,
যন্ত্রণায় ভ্রূকুঞ্চিত দন্তে চাপি' কম্পিত অধর
তুমিই জ্বালাবে দীপ মায়ের মন্দিরে,
এ নিরন্ধ্র অন্ধকার অপসৃত হবে ধীরে ধীরে।

তোমারে যে বাসিয়াছি ভালো,
গভীর সে কালরাত্রি—মুখে তব হেরিলাম আলো,
হোমানলে পরিশুদ্ধ, স্নিগ্ধজ্যোতি ললাট-ভাষণ ;
তাইত আগ্রহভরে পাতিলাম তোমার আসন
সহস্র হৃদয়ে, সেথা সর্ব্ব ঊর্দ্ধে তুমি আছ প্রিয়,
বন্দনার অনুবন্ধে দেশে দেশে নিত্য বরণীয়

তারুণ্যের তাপসকুমার
মহান আপন তেজে, চেয়েছিলে আনন্দ ভূমার ;
তাই তুমি ভাবিতেছ মনে
আপনারে রিক্ত করি বাহিরিয়া দাঁড়াবে প্রাঙ্গণে।
তুমি দেখিয়াছ ঘরে ঘরে
নিরস্ত্রের অপমান শুধু গ্লানিভরে
দাসত্বের কলঙ্ক প্রকাশে
সিংহাসন হ'তে প্রভু তাচ্ছিল্যে চাহিয়া মৃদু হাসে,
তারা কিবা দিবে পুরস্কার ?
অতিথিরে আমন্ত্রিয়া যারা রুদ্ধ করে পুরদ্বার
মানের আসন তারা তোমারে কি দিবে ?
সম্মুখ সমরে তুমি সে আসন যে দিন জিনিবে,
আভূমি প্রণত হয়ে সসম্মানে করি সম্ভাষণ
তারাই ছাড়িয়া দিবে ভারতের রাজ-সিংহাসন।
সে সভার শাস্ত্রী যারা সসম্ভ্রমে চাহি' মুখপানে
কোষবদ্ধ তরবারী নিষ্কাশিয়া অতি সাবধানে
উৎসর্গিয়া চরণে তোমার,
আদেশ প্রতীক্ষা করি' সৌভাগ্য গণিবে আপনার।

দিগন্তে ঘনায়ে আসে দুর্দিনের গাঢ় অন্ধকার,
রক্ত-সূর্য্যে রক্তিম পাথার
উত্তাল তরঙ্গ তোলে পশ্চিম-সাগরে।
যৌবনের সিংহাসন 'পরে
তব রাজ্য-অভিষেক বহুদিন হইয়াছে শেষ,
ধর পাশুপাত অস্ত্র, বেছে লও ফাল্গুনীর বেশ,

ধর্ম্মরাজ দাঁড়ায়ে পশ্চাতে।

কুরুক্ষেত্র-মহারণ ভারতের নবীন প্রভাতে,

তরুণের সুখ-স্বপ্ন তুমি আজ করিবে সফল,

সহস্র হৃদয় তাই হয়েছে চঞ্চল

আপনারে রিক্ত করি' শেষ অর্ঘ্য দিতে ;

মন্দির সোপানে তারা দাঁড়াইয়া ধ্যান-মগ্ন চিতে

তোমার উদাত্ত কণ্ঠে শুনিয়াছে মায়ের আহ্বান,

হে শিবাজী মহারাজ, তুলে ধর গৈরিক নিশান।

ডিসেম্বর—১৯২৮—কলিকাতা কংগ্রেসের প্রাক্কালে

মুক্ত ধারা

বহুদিন পরে মিলিল ভাগ্যে তোমার হাতের লেখা
একখানি চিঠি, জানো কি বন্ধু, কত দিবসের আশা ?
আজও মনে পড়ে তোমার সঙ্গে মেঘ-দুর্য্যোগে দেখা,
মনে পড়ে শুধু বন্ধুর পথে বন্ধুর ভালবাসা।

তোমার হাতের অক্ষরগুলি নয়ন মেলিয়া আছে
পড়িতে পড়িতে শুনিতে পেলাম তোমার কণ্ঠস্বর,
মনে হোল যেন কত দূর হোতে তুমি আসিয়াছ কাছে
দুটি বাহু মেলি' জড়ায়ে ধরিলে হরষিত অন্তর।

তুমি ত ভোলনি বন্ধুরে তব, পথের বান্ধবতা,
দূর দুর্গমে তেমনি রয়েছে সরস হৃদয়খানি,
অনল-শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা দুঃখিনী মায়ের ব্যথা
নির্বাসনের অবরোধ হোতে বহিয়া আনিল বাণী।

রোগ-শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবি পুরাণ দিনের কথা
স্বপন দেখিনু মেঘে ঢাকা যেন নব সূর্য্যের আলো,
অন্ধকারের বক্ষ বিদারি' বন্ধন-কাতরতা
রাঙা শতদলে ফুটিয়া উঠিছে, মোরা বেসেছিনু ভালো-

জলন্ত তলোয়ার

ভাল বেসেছিনু বিদ্যুৎ-অসি ঝলসি ঝলসি উঠে
ঈশান কোণের খণ্ডিত মেঘে টানা শোণিতের রেখা,
প্রমত্ত ঝড়ে ভাল বেসেছিনু, সে যখন এল ছুটে
সেই এলোমেলো দম্‌কা হাওয়ায় তোমায় আমায় দেখা।

সম্মুখে মোরা দেখিনু চাহিয়া কখন অলক্ষিতে
সারা দেশময় কারার প্রাচীর আকাশে মেলেছে বাহু,
শ্মশান-বহ্নি খাণ্ডবদাহে জ্বলিছে চতুর্ভিতে
ঢাকিয়া ফেলেছে সূর্য্যের আলো ক্ষমতা-দৃপ্ত রাহু।

কারা-প্রাচীরেও নোণা ধ'রে যায় শিকলেও ঘূণ ধরে,
আলোবায়ুহীন আঁধারে আসেন আলোকবিহারী হরি,
পথে প্রান্তরে শ্যামল মাধুরী ফুটে ওঠে থরে থরে,
বিষকন্যার হরিত পাত্র অমৃতে ওঠে ভরি।

সেই সে আশায় দিন গণি ভাই, ঝড়ের রাত্রি গেলে
প্রভাত আলোর আঘাতে ভাঙ্গিবে নির্বাসনের কারা,
দুর্গম পথ বাহিয়া এসেছ পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে
বেশী দূরে নয় সমুখে তোমার উছল মুক্ত ধারা।

১৯৩০—আগষ্ট—জেল হইতে লিখিত সুভাষচন্দ্রের পত্র পাঠের পর।

তোমারে স্মরণ করি

তোমারে স্মরণ করি দীর্ঘ দিন সুদীর্ঘ সর্ব্বরী
অন্তর হইতে ধায় তোমা পানে মন্ত্রের মূর্চ্ছনা,
অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে মোর ধরি
ছন্দো-কুসুমের মাল্যে নিত্য করি তোমার অর্চ্চনা।

যুগ যুগান্তের ধ্যানে অবিকল্প কল্পনায় প্রিয়
কালের প্রবাহ বাহি কূলে মোর ভিড়ালে তরণী,
নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে হে কাণ্ডারী, চির-স্মরণীয়
স্পর্শে তব জেগে ওঠে অবলুপ্ত বিস্মৃত সরণি।

জয়মাল্য নিলে গলে, হৃদয়-নৈবেদ্য নিলে মোর
অকৃপণ প্রীতি তব, সাথে তার চিত্তের প্রসাদ,
মিলন-মঙ্গল-উষা, বিরহ-যামিনী করি ভোর
অবারিত দিবালোকে ঘুচাইল রাত্রির প্রমাদ।

তোমারে রাখিবে দূরে, নিয়ে যাবে আরও কত দূরে ?
সেথায় কি বিস্মৃতির প্রাণহীন পাষাণ প্রাচীর
তোমারে রাখিবে বন্দী ? অলক্ষিত সেই মায়াপুরে
সাধনা বিলুপ্ত হবে অন্ধকারে সে কালরাত্রির ?

১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী কল্যাণ রেল ষ্টেশনে তিন আইনে বন্দী হইবার পর

আকাশ-প্রদীপ

মৃত্যু যার পাহারায় রোগ-শয্যা শিয়রে দাঁড়ায়ে
কর গণে দীর্ঘদিন—যন্ত্রণায় দীর্ঘায়িত রাতি,
তাহারে দণ্ডিত করি দম্ভ চলে সীমানা ছাড়ায়ে
বিনিদ্র নয়ন হতে ঝরিয়া পড়িছে অশ্রু পাতি।

মৃত্যু-পথযাত্রী বটে তবু তার সে অশ্রু বর্ষণ
ভয়ে নহে, ক্ষোভে নহে, নহে দুঃখে, নিষ্ঠুর আঘাতে
উৎসর্গের মহানন্দে জন্ম তার, পুলক হর্ষণ
প্রশান্ত ললাটময় সঞ্চারিত আজি সুপ্রভাতে।

মৃত্যু-ভয় অবহেলি যন্ত্রণারে ভ্রূকুটি করিয়া
আকণ্ঠ করিল পান কালকূট, সুধাপাত্র ফেলি,
কি ভয় দেখাবে তারে মৃত্যু-বিভীষিকা বিস্তারিয়া
শ্মশান-বৈরাগ্য সাথে আজন্ম যে বেড়াইল খেলি।

ভীরু যে পৌরুষহীন, পুরুষের সে রাখে না মান
সদা মৃত্যুভয়াকুল সেই হানে গুপ্ত প্রহরণ,
অমূলক আশঙ্কায় আচম্বিতে সেই বধে প্রাণ
তাহারে করুণা করি' বীর অস্ত্র করে সম্বরণ।

সে বীর কৌশলে বাঁধা, রোগদৈত্য নৃত্য করে বুকে
শ্বাস রুধি বহিতেছে পুতিগন্ধ-সংক্রামিত বায়ু,
অর্গলিত দ্বারে দ্বারে উন্মুক্ত সঙ্গীন আছে রুখে
অন্ধকার গৃহ-কোনে—নির্ব্বাণ-উন্মুখ পরমায়ু।

যে দীপ নিবিতে পারে ফুৎকারে বা মৃদু বায়ুভরে
তাহারে নিক্ষেপি দূরে যারা করে শক্তি অপচয়,
খুঁড়িয়া সমাধি তারা মৃতের কঙ্কালে বন্দী ক'রে
ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া ন্যায়দণ্ড রাখিছে অক্ষয়।

তাহাদের কাছে মোরা নহি কোনও লাভের প্রত্যাশী
অনুচিত আচরণ নৈমিত্তিক তাহাদের ব্রত,
অগণ্য বন্দীর দল চোখে মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি
কেবা দেখে কোন অস্ত্রে বিষদিগ্ধ নগণ্যের ক্ষত।

সে ক্ষত বাড়িয়া চলে আঘাতে আঘাতে রাত্রিদিন
কেহ মরে আচম্বিতে, কেহ মরে তিল তিল করি'
আত্মদহনের ব্রত মৃত্যুরে করেছে ইচ্ছাধীন,
দুর্গম যাত্রার পথে দীপ্ত দীপ রাখিয়াছে ধরি।

সে দীপ আঁধারনাশী তামস হইতে জ্যোতির্লোকে
সর্ব্বভয় বিনাশিয়া করিছে সংশয় নিরসন,
আকাশ-প্রদীপ সে যে স্বপ্রকাশ আপন আলোকে,
পথিকে দেখায় পথ আপনারে দহি সর্ব্ব খন।

১১ই অক্টোবর ১৯৩৩—স্বাস্থ্যভঙ্গের পর সুভাষচন্দ্র তখন ভিয়েনায়

তুমি তারে বাঁধিবে কেমনে ?

তুমি তারে বাঁধিবে কেমনে ?
আপনি সে রচিয়াছে আপনার মাথার উপরে
আকাশের নীল চন্দ্রাতপ,
ঊর্দ্ধাকাশে সূর্য্যচন্দ্র পদতলে সাগর-অম্বরা
ধরণী লুটায়ে পড়ে বন্দনার অনুবন্ধ ছলে।
বাতাসে যে মেলিয়াছে আপনার মুক্ত পক্ষ দুটি,
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া চলে অজানিত সে নিরুদ্দেশ পথে
তাঁহারে বাঁধিতে চাও তোমরা সে কিসের বন্ধনে ?

শৃঙ্খলের ?—শুনে হাসি পায়,
স্মিত হাস্যে একবার অবহেলে যদি সে তাকায়
আপনি খুলিয়া যায় নির্ম্মম সে কঠিন বন্ধন।
অটুট গ্রন্থিতে তা'র দেখ নাই কুসুম বিস্তার ?
দেখনি কী যাদু বলে লোহার কঠিন দেহ ভেদি'
কোমল পিযূষ ধারা গলে পড়ে তৃষার্ত্ত ধরায় ?
তুমি কি বাঁধিতে পারো যে আসিছে মাতৃসন্দর্শনে ?
অভয়া মায়ের ছেলে ভয় কা'রে বলে সে জানে না,
বিশাল বাহুতে বল, মাতৃদুগ্ধ জিহ্বায় সঞ্চিত
জন্মকাল হ'তে তারে সঞ্জীবিত রেখেছে ধরায়।

অনশনে মরে নাই, প্রত্যক্ষ দেখেছ তুমি তার
পাষাণ-প্রহত দেহে হইয়াছে জীবন সঞ্চার,
দণ্ডাঘাতে হাসিয়াছে—অবিচারে দ্বিরুক্তি করেনি
পৌরুষের অহঙ্কারে যাচিয়া যে যায় নির্ব্বাসনে।

পাষাণ প্রাচীর ঘেরা এ বিশাল পৃথিবী-কারায়,
তাহারে বাঁধিতে পারো? মুক্ত মন, অনিবার্য্য গতি,
কে তারে বাঁধিতে পারে? দুর্য্যোগে সে দুর্জ্জয় সৈনিক
জননীর আশীর্ব্বাদ বর্ম্ম সম দেহ রক্ষা করে,
অবনত এ ভারতে চিরদিন সমুন্নত শির।

১৯৩৬—৮ই এপ্রিল, আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে দেশে ফিরিবার সময়—বোম্বাই পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ৩ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়

তুমি তারে বাঁধিবে কেমনে ?

তুমি তারে বাঁধিবে কেমনে ?
আপনি সে রচিয়াছে আপনার মাথার উপরে
আকাশের নীল চন্দ্রাতপ,
উর্দ্ধাকাশে সূর্য্যচন্দ্র পদতলে সাগর-অম্বরা
ধরণী লুটায়ে পড়ে বন্দনার অনুবন্ধ ছলে।
বাতাসে যে মেলিয়াছে আপনার মুক্ত পক্ষ দুটি,
মুহূর্ত্তে ছুটিয়া চলে অজানিত সে নিরুদ্দেশ পথে
তাঁহারে বাঁধিতে চাও তোমরা সে কিসের বন্ধনে ?

শৃঙ্খলের ?—শুনে হাসি পায়,
স্মিত হাস্যে একবার অবহেলে যদি সে তাকায়
আপনি খুলিয়া যায় নির্ম্মম সে কঠিন বন্ধন।
অটুট গ্রন্থিতে তা'র দেখ নাই কুসুম বিস্তার ?
দেখনি কী যাদু বলে লোহার কঠিন দেহ ভেদি'
কোমল পিযূষ ধারা গলে পড়ে তৃষার্ত্ত ধরায় ?
তুমি কি বাঁধিতে পারো যে আসিছে মাতৃসন্দর্শনে ?
অভয়া মায়ের ছেলে ভয় কা'রে বলে সে জানে না,
বিশাল বাহুতে বল, মাতৃদুগ্ধ জিহ্বায় সঞ্চিত
জন্মকাল হ'তে তারে সঞ্জীবিত রেখেছে ধরায়।

অনশনে মরে নাই, প্রত্যক্ষ দেখেছ তুমি তার
পাষাণ-প্রহৃত দেহে হইয়াছে জীবন সঞ্চার,
দণ্ডাঘাতে হাসিয়াছে—অবিচারে দ্বিরুক্তি করেনি
পৌরুষের অহঙ্কারে যাচিয়া যে যায় নির্ব্বাসনে।

পাষাণ প্রাচীর ঘেরা এ বিশাল পৃথিবী-কারায়
তাহারে বাঁধিতে পারো? মুক্ত মন, অনিবার্য্য গতি,
কে তারে বাঁধিতে পারে? দুর্য্যোগে সে দুর্জ্জয় সৈনিক
জননীর আশীর্ব্বাদ বর্ম্ম সম দেহ রক্ষা করে,
অবনত এ ভারতে চিরদিন সমুন্নত শির।

১৯৩৬—৮ই এপ্রিল, আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে দেশে ফিরিবার সময়—বোম্বাই পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ৩ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়

আরতি

তব আরতির স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বেলেছিনু অন্তরে
অদৃশ্য হতে সে দীপশিখায় তব নয়নের আলো,
বাঁচায়ে রেখেছে ঝড় ঝঞ্ঝায় আমার নিভৃত ঘরে
আজি মুক্তির আলোকে তাহারে নূতন করিয়া জ্বালো।

তোমার মধুর স্মৃতিরেণু মাখি' কত বিচিত্র ফুল
নিশিদিনমান উঠেছে ফুটিয়া মনের গহন বনে,
কত দিবসের আনন্দে মন সৌরভে সমাকুল
সে ফুলে গেঁথেছি বরণ মালিকা তব অভিনন্দনে।

অযুত যাত্রী চলিয়াছে পথে তব দরশন লাগি'
হর্ষমুখর অভিনন্দনে জনতা বাড়িয়া চলে,
তারি সাথে সাথে মন চলে মোর আমি থাকি দূরে জাগি
কুণ্ঠিত জনে ক্ষমিও বন্ধু, ভুলিও না কোলাহলে।

সার্থক হোক সাধনা তোমার, দুর্গম পথে জয়
তব অন্তর-আলোকে হউক নবীন অভ্যুদয়।

১৯৩৭—১৭ই মার্চ্চ বিনা সর্ত্তে মুক্তি লাভের পর ৬ই এপ্রিল কলিকাতায় নাগরিক সম্বর্দ্ধনা

কাল-বৈশাখী

ফাগুন রাতের উদাসী হাওয়ারে ডাকি'
বলেছিলে তুমি—"ফিরে যাও, ফিরে যাও
এখন সময় নাই,
ফাগুনের বনে যে ফুল ফুটিত তারে কি দেখিতে পাও ?
তাইত ভুলিয়া যাই,
পায়ে চলা পথে কি জানি কাহারে হেলায় এলাম রাখি'।"

দুয়ারে তোমার মৃদু করাঘাত করি'
নব বসন্ত ডেকেছিল কতবার
তুমি তা' তোলনি কানে,
হৃদয়ে তখন চলিছে তোমার আলোড়ন ঝঙ্কার,
সেদিন বাঁশীর তানে
কাল-বৈশাখী দূর হতে দিল বজ্রের সুর ভরি'।

ঘরের শঙ্খ বেজেছিল আঙিনায়
তুমি বলেছিলে,—"এখন বন্ধ থাক
প্রভাত হইতে বাকি,
মেঘে বিদ্যুতে এবার এসেছে বাহিরে যাবার ডাক,
নিজেরে গোপন রাখি'
এই কি সময় লঘু পাখা মেলি' ভেসে যাওয়া দখিনায় ?
এবার যাত্রা স্থুরু হবে মোর গহীন অন্ধকারে
ফাগুন দিনের গান গেয়ে মোরে ডেকোনাক বারে বারে।"

জ্বলন্ত তলোয়ার

দাঁড়াও বন্ধু, ক্ষণেক দাঁড়াও কাছে—
মনে কি পড়ে না সেদিনের উৎসব ?
নব বৈশাখী দিনে,
প্রভাত বেলায় বন্দীশালায় উঠেছিল কলরব
তোমারে নিলাম চিনে,
তুমি আগে আগে,—বিপুল জনতা চলিতেছে পাছে পাছে।

সেদিন পথের দু'ধারে দাঁড়ায়ে যারা
উৎসাহ ভ'রে দিয়েছিল করতালি,
তারাত আসেনি সাথে,
তবুও আশায় সজাগ পাহারা ঘরে ঘরে দীপ জ্বালি'
অনিদ নয়ন পাতে
তারা করেছিল স্বপ্ন রচনা তোমাতে আত্মহারা।

ফিরিবার বেলা আবার বাজিবে শাঁখ
দেহলী মঞ্চে পড়িবে আলিম্পন,
আজ তুমি যাও চলে,
সাথে নিয়ে যাও আমা সবাকার প্রাণের আকিঞ্চন
কোথাও আকাশ তলে
মেঘে বিদ্যুতে কাল-বৈশাখী হঠাৎ দিয়েছে ডাক।
তোমার যাত্রা সুরু হোক তবে আঘাতে ও সংঘাতে
সম্বিৎ আনো মোহনিদ্রায় বজ্র-কঠিন হাতে।

২৪শে জানুয়ারী ১৯৪১—ভারতবর্ষ হইতে সকলের অজ্ঞাতে মধ্যরাত্রে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর

আবার কি ডাকিবে আমারে ?

আবার কি ডাকিবে আমারে ?
তোমার গৃহের দ্বারে
তেমনি সহাস্য মুখে অভ্যর্থনা করিবে আবার ?
—খুলিবে হৃদয়-দ্বার
বহুদিন পরে সঙ্গোপনে
নিরালায় বসিব দু'জনে ?

তোমার সকল কর্ম্মে সব প্রত্যাশায়
সকল মহৎ প্রচেষ্টায়
বিপদে সম্পদে কিম্বা দূর যাত্রাপথে
আপন অন্তর হ'তে
যখনি ডেকেছ বন্ধু ব'লে,
তখনি এসেছি চ'লে ;—
নির্ব্বিচারে হৃদয়ের সকল সম্বল
তোমারে দিয়েছি ডা.ল, চিত্ত অচঞ্চল
তোমা 'পরে ;—আমার নয়নে দীপশিখা
সে কি দেখেছিল তব ললাটের দীপ্ত জয়টিকা ?

তোমারে দেখেছি বন্ধু, উগ্রতপা কঠোর সন্ন্যাসী
ভোগের প্রাচুর্য্য মাঝে বৈরাগী উদাসী ;

তোমার সে ত্যাগের মহিমা
আপনার সৌন্দর্য্যের সীমা
আপনি সে জানেনাক
ধরণীর বিনীত প্রার্থনা মানেনাক ;
স্থির দৃষ্টি বহু উর্দ্ধে তার
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে রক্তমাংসে গড়া এ সংসার।

তোমারে দেখেছি বন্ধু, অকিঞ্চন বন্ধুত্ব-ভিখারী,
আপনার অন্তর বিথারি'
আলিঙ্গন দিয়েছ বন্ধুরে ;
আজি তুমি আছ বহু দূরে,
তবু উষ্ণ স্পর্শখানি তার
নিত্য অনুভব করি।—এ বিরহ-বেদনার
শেষ নাই, সীমা নাই ; তাই সর্ব্বক্ষণ
নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে ধেয়ে চলে অশান্ত এ মন।

স্মৃতির মঞ্জুষা খুলে দেখি একে একে
বিদায়-বেলায় তুমি কত ধন গিয়েছ যে রেখে।
বাহিরে কঠোর তুমি, সে তোমার আত্মার নির্ম্মোক
সেই পরিচয়ে তোমা জানে সর্ব্বলোক।
তারা ত জানে না পুষ্প পরাভব মেনেছে গোপনে
হাসিমুখে অতি সন্তর্পণে
হৃদয়ের কাছে তব ; আমি জানি কত সুকোমল
পেলব পল্লব সম সে হৃদয় বেদনা-চঞ্চল

তোমার নয়নে
যে বিদ্যুৎ খেলে ক্ষণে ক্ষণে,
কুঞ্চিত ললাটে তব ঘনায়ে যে ওঠে কালো মেঘ
স্ফুরিত অধরে স্তব্ধ যে দুর্মদ বেগ—
তাহারি পশ্চাতে আছে কী গৈরিক জ্বালা
সে কথা ত জানি আমি ; একান্ত নিরালা
তোমারে পাব কি কাছে ? সেই দিন সে নীরব ক্ষণে
তোমারে বলিব বন্ধু, অন্তরের কথা সঙ্গোপনে।

কত দূরে আছ বন্ধু, কত কাল রহিবে সুদূরে ?
সেথাকার বাঁশী বুঝি হেথাকার সুরে
মূর্চ্ছনায় বাজে সুমধুর
তোমার অন্তর তলে ! বেদনাবিধুর
হেথাকার গান বুঝি তরঙ্গিত সেথায় বাতাসে ?
নব অভ্যুদয়ের আশ্বাসে
দিন যায়, রাত্রি যায়, শেষ হয়ে আসে পরমায়ু,
হেথাকার ভূমি জল বায়ু
আর্ত্তনাদে জানায় মিনতি—
সূর্য্যালোকে দীপ্ত দেবজ্যোতি
তাদের ফিরায়ে দাও, কতকাল রাখিবে বঞ্চিত ?
যুগ হতে যুগান্তে সঞ্চিত
অপরাধ—এ দেশের মহা অপরাধ,
জানি জানি, পদে পদে ঘটিয়াছে নিত্য পরমাদ ;
তার শাস্তি এখনো কি বাকি ?

অনন্ত আলেয়ার

ছায়ার এ ফাঁকি

এখনো সত্যের কাছে আপনারে দিবেনাক ধরা ?

দয়াময়ী সর্ব্বদুঃখহরা

মুক্তি-উষা দিবেনাক দেখা ?

বালার্ক কিরণ-রেখা

কত দূরে—কত দিনে নয়নের আগে

ফুটিয়া উঠিবে বল ? নব অনুরাগে

তোমার যাত্রার পথে অগ্রসরি দেখিব সম্মুখে

তুমি আছ দাঁড়াইয়া—নব-সূর্য্য উদ্ভাসিত মুখে।

১৯৪৩—জানুয়ারী

আজাদ হিন্দ্ সৈনিকের প্রতি

উদয় অচল দূর দিগন্তে, অটল মহিমা তার
তারও পরে আছে ঘন অরণ্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা,
গিরি-নদী বহে, এপারে ওপারে অস্ফুট তার ধ্বনি
জলতরঙ্গে উদ্বেল হয় গভীর নিশীথ রাতে।
নিশীথ রাতের তপস্যা সেথা উষার আলোকপাতে
তিল তিল করি' প্রতিদিন আনে সিদ্ধির শুভফল,
গোপন গুহায় ধ্যান-সমাহিত সেথায় সব্যসাচী
বন্দনা করে নব সূর্য্যের নূতন মন্ত্র গানে।

সেদিন আকাশ বিদীর্ণ করি' ছুটিল অগ্নি-রথ
বজ্র সেদিন গরজি উঠিল সহসা মুহুর্মুহু,
পাহাড়ের গায়ে লিখে দিয়ে গেল অদ্ভুত যে বারতা
সে বারতা কভু জীবনে শোনেনি ক্ষমতাদৃপ্ত নর।
সে দিন সহসা জাগিয়া উঠিল মৃত্যুর গর্জ্জন
গোপনে গোপনে অন্তরীক্ষে শত্রুর দম্ভোলি,
মৃত্যুকে যারা বুক পেতে নিল অনায়াস মহিমায়
তাদের মৃত্যু নবজীবনেরই নূতন সম্ভাবনা।
সম্ভাবনার কঠোর সাধনা নদী গিরিবন ব্যাপি'
স্থির হয়ে আছে ঝড়ের আশায় আপনারে সম্বরি',
তোমাদের গুরু সেই সাধনার অনঘ মন্ত্র বলে
লভিয়াছে বর মৃত্যু-জয়ের অনলে আহুতি দিয়া,
নির্ব্বাণহীন আহিতাগ্নির সমিধ এখনও জ্বলে
তোমাদেরও মনে রাখিও জ্বালিয়া সে হোমবহ্নি শিখা।

১৯৪৫

স্বাপ্নিক

তোমার স্বপ্ন, মোদের স্বপ্ন, স্বপ্নের কুহেলিতে
ঢেকে গিয়েছিল ;—তবু স্বপ্নের ঘোর লেগে ছিল চোখে
চোখের জলের আল্‌পনা আঁকা মন্দির দেহলিতে,
এখনো তাহার চিহ্ন রয়েছে জানে তা' সর্ব্বলোকে।

একদা তোমার যাত্রার পথে যারা করেছিল ভীড়
ভেবেছিল তুমি তাদেরি মতন নিরাশায় যাবে ফিরে,
তারাত জানে না বজ্র কখনো আকাশে বাঁধে না নীড়
উদ্বেল স্রোত থামে না কখনো ক্ষুব্ধ সাগর তীরে।

অন্তর তব বেদনা-আহত নয়ন স্বপ্নাতুর
সে দুটি নয়নে বহ্নির শিখা ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জ্ব'লে,
স্বাপ্নিক তুমি যুগান্ত আগে দেখেছিলে বহু দূর
তাই জ্বেলেছিলে যজ্ঞ-অনল মার মন্দির তলে।

তুমি যেচে নিলে কালিমা-মুক্ত আপন নির্ব্বাসন
পথ বেছে নিলে ধ্যান-দৃষ্টিতে, মহা সঙ্কট কালে
কোথা তুমি,—তবু কোটি মানবের হৃদয়ে তব আসন
তোমারি আশায় দিন গুণে যায় কালের অক্ষমালে।

স্বপ্ন স্বপ্ন তোমার স্বপ্ন, মোদের স্বপ্ন তুমি
সফল করিলে যাদুদণ্ডের অমোঘ স্পর্শ দিয়া,
সেদিনও হেথায় স্বপ্ন-কাতর তোমার জন্মভূমি
ঘুমভাঙা চোখে পথপানে চাহি, আবেগে অধীর হিয়া।

তুমি আগে এলে পশ্চাতে তব অযুত লক্ষ সেনা
সম্মুখে স্থির একই লক্ষ্য—দিল্লীপ্রাসাদ-চূড়া
পায়ে পায়ে এলে সুদীর্ঘ পথ—সে পথ তোমার চেনা,
সে পথে পাথর বীরপদভরে' হয়ে গেল ধূলিগুঁড়া।

বিজয়-নিশান যারা উড়াইল পূর্ব্ব অচল 'পরে
প্রথম প্রভাতে নব সূর্য্যের প্রভাতী বন্দনায়,
দেশের মাটির বিদীর্ণ বুকে বুঝি এতদিন ধ'রে
তাদেরি প্রাণের স্পন্দন আজ রক্তের সাড়া পায়?

মায়ের বুকের রক্তের ধারা লাখো লাখো ধমনীতে
চঞ্চল হোল, অধীর আবেগে এবার যাত্রা সুরু,
যেথা আকণ্ঠ পিপাসা সেথায় ধারাজল ঢেলে দিতে,
আবার আকাশে শ্রাবণের মেঘ ডেকে যাবে গুরু গুরু।

সেই সে মেঘের বুক চিরে চিরে জ্বলন্ত তলোয়ার
এঁকে বেঁকে যাবে কালো পাহাড়ের জমাট অন্ধকারে,
দুর্গম পথে অগণ্য সেনা দাঁড়াইবে হুঁসিয়ার
হেথা অদৃশ্য ঘন করাঘাত হানিবে বন্ধ দ্বারে।

বন্দীশালায় জাগিবে বন্দী সেই সে প্রভাত কালে
কোটি মানবের মিলিত কণ্ঠে উঠিবে জয়ধ্বনি,
পথে প্রান্তরে শ্মশানে শ্মশানে কোটি নরকঙ্কালে
শুনিব অমৃত অগ্নি-মন্ত্র উঠিতেছে রণরণি।

মৃত্যু-বাসর জেগেছে যাহারা আজও তারা বেঁচে আছে,
হয়ত তাহারা আবার দেখিবে মরণ-মহোৎসব,
সেই মুহূর্ত্তে তুমি কি বন্ধু, আসিবে তা'দের কাছে
চিতার আগুনে দিগন্তব্যাপি জ্বেলে দেবে খাণ্ডব ?

সেই খাণ্ডব-দহন-জ্বালায় জ্বলিবে অহঙ্কার
ক্ষমতাদৃপ্ত হীন প্রভুত্ব মাটিতে মিশিয়া যাবে,
চল্লিশ কোটি শিকল ভাঙার উঠিবে ঝণৎকার
যত মূর্চ্ছিত মুমূর্ষু দেহ সম্বিত ফিরে পাবে ?

যে পথে এসেছ সে পথ আজিও তোমারি প্রতীক্ষায়
প্রহর গণিছে কখন তোমার সাধনার হবে শেষ,
আবার তোমার জয়-যাত্রার মিলিত তপস্যায়
কোটি কণ্ঠের জয়-ধ্বনিতে মুখরিত হবে দেশ।

১৯৪৬—জুন

'৪৬ এর আগষ্ট

ধর্ম্ম আমি মানিনাক
মানিনাক সত্যের বড়াই ;
নীতি বাক্য শুনে মনে হয়
সে কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা ;
খাদ্য খাদকের মাঝে
যে সম্বন্ধ ব্যাপ্ত পৃথিবীতে
সেই সত্য বহুরূপী, অন্ধকারে অতি মনোহর ;

মানুষের মনুষ্যত্ব
স্নেহ-প্রীতি দয়া দাক্ষিণ্যের
শেষ চিহ্ন মুছে গেছে,
মুছে গেছে ভাস্বর করুণা ;
সূর্য্যের আলোর মত অকৃপণ অনুকম্পা আজ
পুঁথির পাতায় লেখা
নাহি তার চিহ্ন মাত্র মনে।

আমরা সুসভ্য জাতি
শিক্ষাদীক্ষা আদর্শে উন্নত ;
প্রাচীন ঐতিহ্যে সমুজ্জ্বল
আমাদের শাস্ত্র ইতিহাস,
বিশ্বশ্রুত সাহিত্য দর্শন,
আমাদের সুমহান জাতি।

জলন্ত তলোয়ার

হিংসুক আরণ্য মন
কদর্য্য কুৎসিত কল্পনায়
সে বর্ব্বরও ছিল ভাল ;
অরণ্যে ও পর্ব্বত-গুহায়
হিংস্র পশুর সনে অহর্নিশি করেছে সংগ্রাম
মৃগয়া-প্রলুব্ধ মন
উষ্ণ রক্তে জিহ্বা লোভাতুর
নির্ম্মম পাষণ্ড তারা আদিম মানুষ ;
সে পশু-মানুষে চিনি ;
আজি তার নব পরিচয়
আত্মঘাতী সংগ্রামের কলুষিত রক্তের আখরে
লেখা হয়ে থেকে গেল
অবিশ্বাস্য কল্পনা অতীত।

আমরা সুসভ্য জাতি
মার্জ্জিত রুচির অধিকারী,
আমাদের ইতিহাসে
লেখা আছে বীরত্ব-কাহিনী ;
বীর শত্রু যোগ্যস্থানে
যথাযোগ্য পেয়েছে মর্য্যাদা,
শরণাপন্নের তরে যুদ্ধক্ষেত্রে, শত্রুর শিবিরে
আশ্রয় উন্মুক্ত ছিল—
বীরের মহৎ ধর্ম্ম ক্ষমা দুর্ব্বলেরে
—এই ছিল উচ্চ রণনীতি।

এ নহে সমর ক্ষেত্র,
স্বাধীনতা-সংগ্রামও এ নহে ;
দুর্গম বন্ধুর পথ বাহি'
আজি মোরা আসিয়াছি
মুক্তি-মণ্ডপের সীমানায়।
এখনও সুদীর্ঘ পথ,
এখনও সুদীর্ঘ বিভাবরী ;
উপরে আকাশ জোড়া কালো মেঘে ম্রিয়মান দিন,
কণ্টকে সঙ্কট তবু উন্মুক্ত প্রশস্ত রাজপথ,
—যে পথে আরব্ধ যাত্রা
ইম্‌ফালের নব সূর্য্যোদয়ে।
কঠিন পার্ব্বত্য ভূমে
সেথাকার ক্ষীণ নদী-স্রোতে
বিজন অরণ্য মাঝে
সংগ্রামের অপূর্ব্ব সাধনা,
মুক্তি-সৈনিকের রক্তে
এখনও বিস্ময় হয়ে জাগে।

সেথায় ছিলনা ধর্ম্ম
যাত্রাপথে দুর্ব্বার পরিখা,
সেথায় ছিলনা জাতি
সঙ্কীর্ণ সীমায় শক্তিহীন ;

সেথায় দেখিনু মোরা ভারতের সকল সন্তানে,
অগ্নি-মন্ত্র-উপাসক নেতাজী গুরুর শিষ্য তারা।
বিশাল ভারতবর্ষে, স্থান আছে সবাকার তরে ;
সেথায় মিছিল করি আজি মোরা হব অগ্রসর,
হাতে হাত মিলাইয়া একই লক্ষ্যে অপলক আঁখি
অন্তরে প্রদীপ্ত আশা, ভরসার মঙ্গল প্রদীপ
মায়ের মন্দিরে জ্বলে
অনির্ব্বান স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল।

আজ সেই রাজপথে
সহসা তুলিল যারা আত্মঘাতী মত্ত কোলাহল,
রক্তের সম্বন্ধ ভুলি' বহাইল রক্তের প্লাবন,
বিশ্বাসের বন্ধন ছিঁড়িয়া
রুখিয়া দাঁড়াল পথে মুছে ফেলে আত্ম-পরিচয়,
তারা কি দেখেনি চোখে সেদিনের আলো
নিঃশেষে মুছিয়া গেল,
নেমে এলো রাত্রির কালিমা ?
কোথায় বিলুপ্ত হোল সভ্যতার পরিচ্ছন্ন রূপ ?
আপন নির্মোক ভাঙ্গি'
আদিম হিংস্র অজগর
বাহিরিয়া এল পথে,
কুটিল সর্পিল গতি অতি ভয়ঙ্কর ;
বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তার
জ্বলে গেল সৃষ্টির মহিমা।

এ নৃশংস বর্ব্বরতা,
শোনিত-প্লাবন মাঝে ঘাতকের উল্লাস নর্ত্তন—
এর কি হবেনা শেষ ?
মৃত্যুক্রান্ত ধরণীর
বিশীর্ণ মলিন মুখে আর
ফুটিবে না প্রভাতের আলো ?
প্রসন্ন দিনের সম্ভাবনা
আনিবে না সঞ্জীবনী আশা ?
যে জনের আবির্ভাব তরে
জননী দাঁড়ায়ে দ্বারে
হাতে লয়ে মঙ্গল-প্রদীপ,
তরুণ তরুণী গাঁথে জয়মাল্য বিজয়ীর তরে',
শিশুর আনন্দ-কোলাহলে
আজি নিত্য মুখরিত ঘরে ঘরে যাহার বন্দনা,
সে কবে ফিরিবে ঘরে ?
মধুর উদাত্ত কণ্ঠে
সে কবে ডাকিয়া লবে পথভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানে ?

১৯৪৬, আগষ্ট

দিশারী

তুমি যদি শুধু আজিকার দিনে দাঁড়াইতে সম্মুখে
অঙ্গুলি তুলি একবার যদি জানাইতে সঙ্কেত,
জনসমুদ্রে মত্ত তুফান দিগ্ দিগন্ত হ'তে
মন্ত্রশক্তি সম্বরি' নিত প্রলয়ের গতিবেগে।

রুদ্ধ মনের মত্ত আবেগ আজিকে মানে না বাধা
ক্ষুব্ধ মনের অসহ্য দাহ জ্বলে ওঠে বারে বার,
ভুলে যায় তা'রা তোমার সাধনা, তব সাবধান বাণী
প্রাণ হরণের দুর্জ্জয় লোভে হয়ে যায় একাকার।

তুমি ত চাহনি জীবনে কখনো ব্যর্থ জয়ধ্বনি
সংযমহীন সাধনার পথে বিফল আত্মনাশ,
তুমি যদি আজ সমুখে দাঁড়ায়ে শুনাতে তোমার বাণী
পথের দিশারী, এক মুহূর্ত্তে থেমে যেত কোলাহল।

পথের জনতা ভুলে যায় পথ, এ মোহ সর্ব্বনাশা
হীন দুর্গতি কদর্য্য পথে ঠেলে দেয় অমানুষে।

১৯৪৬, আগষ্ট

স্বাক্ষর

দেখেছ কখনও—কালমেঘ চিরে
বজ্র ছুটিয়া চলে—
সেই বজ্রের অগ্নি-ফলায়
মেঘের অগ্নিদাহ,
বৃথা গর্জ্জনে পলায়িত মেঘ
ভেঙে পড়ে চৌদিকে
ছিন্নভিন্ন দিগ্‌ দিগন্তে
উড়িয়া উধাও ঝড়ে ?

কখনও দেখেছ সেই বজ্রের
গলিত লাভার স্রোত
ধারা বৃষ্টির পরতে পরতে
ছড়ায় অগ্নি-জ্বালা,
কখনও দেখেছ অগ্নি-বৃষ্টি
শ্যামল ধরার বুকে
রেখে দিয়ে যায় দগ্ধ মাটির
উগ্রগন্ধী ধোঁয়া ?

দেখে যদি থাক, আর একবার
মানস-নয়ন মেলি'
দেখ দূর পথে উর্ধ্ব আকাশে
তেমনি বহ্নি-লীলা,

বজ্রের বুকে জ্বলে জ্বলে ওঠে
কোন্ সে দহন-জ্বালা,
মেঘের বক্ষ বিদারি সে জ্বালা
নেচে চলে কৌতুকে।

কখনও দেখেছ ঘন অরণ্যে
পর্ব্বত-গুহা হ'তে—
ধীরে বাহিরায় ক্ষুধিত ব্যাঘ্র
শিকারের সন্ধানে
তীর্যক আলো ঠিকরে নয়নে
শাণিত দন্ত-পাঁতি
দৃঢ় পদে চলে চিহ্নিত পথে
অনায়াস মহিমায়?
তারে যদি বল হিংস্র পশু
কিবা তাতে আসে যায়
সে যে সৃষ্টির অপরূপ শোভা
পৃথিবীর বিস্ময়।

কখনও দেখেছ নীল সমুদ্রে
উঠেছে হাজার ঢেউ
যেন বিদ্রোহী বাসুকি মেলিছে
শত সহস্র ফণা,
পাতাল-পুরীর নাগ-কন্যারা
বেণীবন্ধন খুলে
বুঝি বা জাগাল সর্প-বাহিনী
দুর্জ্জয় অভিযানে।

তীরবেগে তারা ছুটে চলে আসে
স্তিমিত সিন্ধুতীরে,
হঠাৎ কে যেন কশাঘাত করি'
জাগায় স্বপ্নাতুরে।
কূলে কূলে জাগে কল-কল্লোল
গাছে গাছে ঝড়ো হাওয়া,
লোকালয়ে জাগে সেই অগণ্য
স্রোতের চঞ্চলতা ;
পথে প্রান্তরে কঙ্কালে জাগে
জীবনের হিন্দোলা,
সাগর-জাগান শুনেছ মন্ত্র—
দেখেছ সে যাদুকরে ?

যদি দেখে থাক, আর একবার
নয়ন মেলিয়া দেখ,
বহুদূর হ'তে স্ফীত উন্নত
কিসের জনস্রোত,
আগাইয়া আসে হাজারে হাজারে
সংগ্রামী সেনাদল
এই ভারতের মুক্তি সাধনে
প্রাণ দিতে আগুয়ান।

দেখেছ কখনও মহা অন্যায়ে
প্রেতায়িত জনভূমি,
অত্যাচারের জঘন্যতায়
পশুও ফিরায় মুখ,

শক্তিমদের মহা মত্ততা
ফেনিল তীব্র বিষে,
মৃত্যুর নীল পাথারে ভাসিছে
অগণ্য জীব দেহ ?
তারি সাথে সাথে দেখেছ কখনও
বজ্র-অনল বুকে,
নয়নে বহ্নি ঠিকরিয়া পড়ে
ছুটে চলে প্রাণপণে—
কোথায় বৈরী ? গোপন অস্ত্র
কোথা ঝলসিয়া ওঠে ?
সেই সে অস্ত্রে আপন ললাটে
রক্ত-তিলক আঁকে।

গৃহীরে করেছে গৃহ-হারা যারা
গোপনে অতর্কিতে
স্বাধিকার হ'তে বঞ্চিত রাখি
করেছে সর্ব্বহারা,
শস্য-শ্যামল ক্ষেতের ফসল
দম্ভে দু'পায়ে দলে
যারা চলে গেছে উপেক্ষা করি'
রিক্তের হাহাকার ;
মাটি হ'তে যারা সঙীনের ঘায়
তুলিয়া গলিত শব
ফাঁসিকাঠে তুলে ব'লে—এ বিচার
শাস্তি অপরাধের—

নিরস্ত্রে করি' অস্ত্রে শাসন
বীর বলে খ্যাতি চায়
তাদের শাস্তা বীরবাহু কা'রে
দেখেছ কখনও চোখে ?

তোমরা দেখেছ ইতিহাসে লেখা
পলাশীর প্রান্তরে
যুদ্ধের নামে মহা প্রহসন
দুরভিসন্ধি কা'র—
উমিচাঁদ আর মীরজাফরের
তক্ত-তাউস তলে
তরুণ নবাব সিরাজের শির
লুটায় রক্তস্রোতে ;
সেই সে রক্তে উদ্বেল স্রোত
গঙ্গার কূলে কূলে
পলাশীর মাঠে ফুটায়ে তুলিল
রক্তপলাশ ফুল।

শুনিতে কি পাও ? এখনও রাত্রে
সিরাজের নাম ধ'রে
ডেকে ডেকে ফেরে মহীয়সী নারী
শোকার্ত্ত স্নেহাতুরা—
লালবাগ আজও লাল হয়ে ওঠে
সিরাজের খুনে খুনে
প্রতি রাত্রের গভীর আঁধারে
চাপা কান্নার স্বরে ?

তারি সাথে সাথে মোহনলালের
মীরমদনের মুখে
শুনিতে কি পাও প্রতিহিংসার
উঠিতেছে হুঙ্কার ?

ডাকে তারা ডাকে সারা বাংলার
হিন্দু মুসলমানে
ডাকে ভারতের চল্লিশ কোটি
নিপীড়িত জনগণে ;
শেষ সম্রাট বাহাতুর শা'র
পুণ্য সমাধিতল
জানো কে সাজা'ল পলাশী মাঠের
রক্ত পলাশ ফুলে ?
দেখ চেয়ে দেখ অপূর্ব্ব ছবি
সেই সিরাজের ধ্যানে
হাজার হাজার মানুষ আবার
তন্ময় হয়ে যায়,
ভোগ-বৈরাগী মহাবলে বলী
সিপাহীসালার ডাকে
লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু—
ভারতের সন্তানে ;
মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করি
পরাইয়া রাঙা রাখী
বেঁধে দিল পথ ভাঙ্গিয়া জাঙ্গাল
দাঁড়াইয়া পুরোভাগে।

তারা এসেছিল পায়ে পায়ে চলি
আনন্দে গান গাহি'
জন্মভূমির সন্তান বীর
দেশের মুক্তি লাগি' ;
তাদের কণ্ঠে ধ্বনি উঠেছিল
জয় ভারতের জয়,
সেই সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি যে
আকাশ বাতাসময়
নব ভারতের নবীন স্রষ্টা
তাহারে প্রণাম করে
হেন অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখেছ—
শুনেছ কাহারও কাছে ?

তোমরা দেখনি আমিও দেখিনি
শুনিতেছি তার কথা,
দেশ-গৌরব এ মহাজাতির
পরম ভাগ্য-লিখা ;
হেন বীরপণা ভারতে লেখেনি
তারি নব ইতিহাস
অগ্নি-আখরে রচিয়া তাহাতে
দিয়ে গেছে স্বাক্ষর।

১৯৪৭—২৩শে জানুয়ারী

তুমি আছ

তুমি আছ তাই এখনো আকাশে, তেমনি চন্দ্রতারা
তেমনি সূর্য্য মধ্যগগনে, প্রদীপ্ত দিবালোক,
তোমারি আশায় নিশীথ রাত্রি রয়েছে তন্দ্রাহারা
তোমার প্রাণের স্পর্শ বাতাসে জীয়ায় সর্ব্বলোক।

তুমি নাই তা'ত বলে না'ক পথ, উদাসীন প্রান্তর,
বলেনা'ক নদী, সমতলভূমি, অসংখ্য গিরিমালা,
"তুমি আছ" তাই বারে বারে বলে কোটি কোটি অন্তর
এখনো সেথায় দীপ্ত বহ্নি ঢালে গৈরিক জ্বালা।

তুমি নাই তা'ত বলে না'ক বন, বলে না বনস্পতি,
বনবিহঙ্গ তোমারে দেখিয়া কুলায় ফিরিয়া আসে,
হিংস্র পশু বিমুগ্ধ আঁখি ভুলিয়া ক্ষিপ্রগতি
মন্থর পায় ধীরে ধীরে আসি বসিছে তোমার পাশে।

প্রাণ-প্রাচুর্য্যে তুমি এনেছিলে লক্ষ জীবনে প্রাণ
জয়যাত্রার পথে বহে গেল তাদের শোণিত-ধারা,
এখনো লক্ষ অভয়ব্রতীর কণ্ঠে তোমারি গান
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তা'রা তোমাতে আত্মহারা।

তুমি যদি নাই, কেন তবে ওঠে জীবনের কলরব
প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণ-বিলাবার অধীর উন্মাদনা?
তুমি আছ তাই এ প্রেতভূমিতে জাগিয়া উঠিছে শব
বন্দীশালার শৃঙ্খলে তাই উঠিতেছে ঝনঝনা।

মনে হয় তুমি কখন আসিয়া দাঁড়াবে আমার কাছে
চির-পরিচিত স্মিত সুহাস্যে করিবে আলিঙ্গন,
তোমার কণ্ঠে আহ্বান, যেন নিকটেই উঠিয়াছে,
নয়নের জলে আসিবার পথে দিলাম আলিম্পন।

তুমি কি আমার ব্যথা বুঝিয়াছ ? আপনি করেছ ক্ষমা ?
বন্ধু বলিয়া তেমনি আমায় ডাকিবে আবার তুমি,
তোমার যে বাণী সেই হবে মোর চির-আরাধ্যতমা
তব মহিমায় মহিমান্বিতা জননী জন্মভূমি।

জানো কি বন্ধু, বার বার কেন মুছি মোরা আঁখিজল ?
সে জলে তোমার নব অভিষেক মোদের হৃদয় তলে,
তোমার আসন বিরচিয়া ফোটে সহস্র শতদল
তব আগমন বার্ত্তা রটিছে সিন্ধুর কল্লোলে।

তোমার পায়ের শব্দ শুনি যে আমার বুকের মাঝে
চমকিয়া উঠি, খনে খনে শুনি' তোমার কণ্ঠস্বর।
তুমি বুঝি আছ নিকটে কোথাও, তাই কি শঙ্খ বাজে
তাই কি আকাশ উষার আলোকে দেখা যায় ভাস্বর ?

মুক্তি-উষার আলোকোজ্জ্বল সুদীর্ঘ পথ ধরি'
হে জন-নায়ক, তোমার যাত্রা পৃথিবীর বিস্ময় ;
এস গো বন্ধু, রাঙা-চন্দনে তোমারে বরণ করি
সমুখে দাঁড়াও, হাতে তুলে দিই জীবনের সঞ্চয়।

১৯৪৭—মার্চ

১৫ই আগষ্ট

বাজাবি শঙ্খ ?   বাজা বাজা ওরে
তবু যদি ঘুম ভাঙে
জমাট বরফ গলে' গলে' যদি
ঢেউ আনে মরা গাঙে।
শ্মশানের বুকে জ্বলেছিল চিতা
সে চিতা এখনো জ্বলে,
রাঙা আকাশের বুকের আগুন
পড়িতেছে গ'লে গ'লে।
রক্তের দাগ এখনো মোছেনি,
পথের বীভৎসতা
পথিকের মনে এখনো জাগায়
ভয়ার্ত্ত কাতরতা।
ঘরের দুয়ার এখনো বন্ধ
পলাতক গৃহবাসী,
আজি উৎসবে কা'র মুখে তুই
কেমনে ফুটাবি হাসি ?
হাসি মরে গেছে দেখিতে পাও না
আধমরা বাঙলায়,
চাপা কান্নার সুর শুনিসনা
বাতাসে ভাসিয়া যায়।

সে বাতাস আজি বিষাক্ত করি'
গলিত শবের দেহ
পথে প্রান্তরে স্তূপাকার প'ড়ে
দেখিতে পাওনা কেহ ?
মন্দির দ্বারে ছড়ান রয়েছে
কঙ্কাল রাশি রাশি
সেথা কি বাজাবি পূজার শঙ্খ
আতঙ্ক ভয় নাশি' ?
মরা মানুষের বধির কর্ণে
সে কি জাগাইবে আশা
নিষ্ফলতার বিহ্বলতায়
দিবে আনি প্রত্যাশা ?

অনেক দিনের আশা প্রত্যাশা
বহু জীবনের ত্যাগে,
হাসি মুখে বহু প্রাণ বলিদান
আজি নিষ্ফল লাগে,
দুর্ব্বহ ভার পরাধীনতার
অসহ বিড়ম্বনা,
পলে পলে মনে জ্বেলেছে আগুন
শৃঙ্খল ঝন্ ঝনা।
সেই আগুনের হল্কা হাওয়ায়
দেখনি কি দাবদাহ ?
স্ফুলিঙ্গে তার ছোটে বিদ্যুৎ
জ্বলে রাজা ওমরাহ ;

সেই দাবদাহে রাজ্য জ্বলেছে
জ্বলেছে শস্ত্রপাণি,
অস্ত্রাগারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
জ্বলেছে মনের গ্লানি ;
ফাঁসিকাষ্ঠের কঠিন রজ্জু
পরতে পরতে তার
জ্বলছে আগুন,—সে যে মনাগুণ—
নিঠুর বঞ্চনার।

জানো না কেমনে ছিঁড়েছে শিকল
খুলেছে বন্দীশালা,
দেয়ালে দেয়ালে পুড়ে হোল ছাই
কা'দের মর্মজ্বালা ;
কা'রা ভেঙ্গে দিল কারার প্রাচীর
ছিঁড়ে দিল শৃঙ্খল,
ফাঁসির মঞ্চে কাদের মরণে
ফুটেছিল শতদল ?
তারা ত চাহেনি এমন মুক্তি
সহস্র প্রাণ দিয়া,
তারা ত চাহেনি মাতৃপূজায়
তরাসে কাঁপিবে হিয়া।
তারা ত চাহেনি নাট-মন্দিরে
পূজারীর আশে পাশে,
প্রসাদ লভিতে নরনারী এসে
ফিরে যাবে সন্ত্রাসে।

তারা ত চাহেনি দেশের মাটির
বিভক্ত অধিকার ;
তারা চেয়েছিল সেবার যোগ্য
অনঘ পুরস্কার।
তাদের স্বপন, দেশের স্বপন
ভেঙ্গে চুরে খানখান,
মিলন-সৌধ রচিবার আশা
হোল আজ অবসান।

মুক্তি এসেছে ঘরের দুয়ারে
সম্মুখে যাত্রাপথ,
আছে সমুদ্র, মরু প্রান্তর
অলঙ্ঘ্য পর্বত ;
ঘরে ঘরে আছে শকুনি মন্ত্রী
বাহিরে দুর্যোধন,
ভীষ্ম নিলেন স্বেচ্ছায় বেছে
সুতীক্ষ্ণ শরাসন।
অর্জুন কোথা ? বৃহদারণ্যে
আত্ম-নির্বাসনে
জাগেন প্রহর কাহাদের পাপে
স্থির হয়ে যোগাসনে ?
শ্রবণে তাঁহার পশে কি না পশে
হেথাকার কোলাহল,
উগ্র তপের বহ্নি-শিখায়
দৃষ্টি অচঞ্চল ;

হেথাকার গ্লানি-বিষের পাত্র
আপনি ধরিয়া মুখে,
এক নিঃশ্বাসে পান শেষ করি,
যন্ত্রণা চাপি' বুকে,
তিনি কি হলেন চির-বৈরাগী
অভিমানে গৃহ-ত্যাগী,
হেথাকার অনুপরমাণু আজ
প্রতপ্ত তারি লাগি।
অথবা ত্যজিয়া মহান সমাধি—
বোম্ বোম্ বলি' মুখে
ত্রিশূল তুলিয়া দাঁড়াবেন ভোলা
আত্মদ্রোহীরে রুখে ?

সে কথা আজিকে কে বলিবে বলো
জানে না সে সংবাদ,
তাই দিকে দিকে ওঠে কোলাহল
ঘৃণিত বিসম্বাদ।
মুক্তি এসেছে তাহারি মন্ত্রে
তাহারি তপস্যায়,
তবু ভীরু মন এখনো সহিবে
অবিচার অন্যায় ?
মুক্তি-তোরণে দাঁড়ায়ে আমরা
শুনিতেছি আহ্বান,
"দাঁড়া ওরে দাঁড়া আবার শুনাব
মহামিলনের গান।"

মুক্তি-নিশান দাও তুলে দাও
সাজাও পূজার ডালা,
চিত্ত-শোধনে হোমাগ্নি-শিখা
বেদীতলে থাক জ্বালা।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭—"পার্ক কল্যাণ সঙ্ঘ"এর স্বাধীনতা উৎসবে পঠিত

স্বপ্ন ও সাধনা

সংগ্রামের হয় নাই শেষ,
নূতন দিনের সূর্য্যালোকে
নবতন আশার আলোকে
এবার পড়িতে হ'বে
বিলুপ্ত বিকৃত ইতিহাস।
দুর্নিরীক্ষ ইঙ্গিতে তাহার
যে সুদীর্ঘ পথ মোরা আসিয়াছি অতিক্রম করি'—
সে পথের হয় নাই শেষ,
ভিতরে বাহিরে আজও
চলিতেছে সেই-সে সংগ্রাম

ভাঙার সংগ্রাম যদি হয়ে থাকে শেষ,
গড়িবার সংগ্রামের এইত সূচনা,
সূচনা আজিকে হোল শৃঙ্খল-মুক্তিতে ;
মুক্তির সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে দিতে হবে সান,
বীর্য্যের পরীক্ষা আজি উপলব্ধ সত্যের সম্মুখে।
মাথা পেতে নিতে হবে
প্রায়শ্চিত্ত আত্ম-দ্রোহিতার,
ঘরে ঘরে বঞ্চনার জনে জনে লাঞ্ছনার গ্লানি
স্বেচ্ছায় বরিতে হ'বে ঋণ শুধি' পূর্ব্ব এশিয়ার।

যে সংগ্রামে জ্বলেছে আগুন
যে আগুনে দগ্ধ হোল জীবনের স্নিগ্ধ শ্যামলিমা,
দুর্ভেদ্য শত্রুর ব্যূহ ধীরে ধীরে পুড়ে হোল ছাই,
ছাই হোল ধন রত্ন তস্করের লুণ্ঠিত ভাণ্ডারে,
সে সংগ্রাম দেখি আজ
নব রূপে অশান্ত আবেগে
দ্বারে দ্বারে হানিছে আঘাত।

সংগ্রামীর জন্মদিনে
নবযুগে নূতন আহ্বান
জাগিয়া উঠুক আজি বিধ্বস্ত নগরে,
ধ্বংসোন্মুখ পল্লী-বাসভূমে,
অনুর্ব্বর শস্য ক্ষেত্রে
অকর্ষিত ধূসর প্রান্তরে,
জনশূন্য পল্লীবাটে, খেয়াহীন ঘাটের কিনারে।
মোহমুগ্ধ দুর্গদ্বারে সে আহ্বান হানুক আঘাত,
স্তিমিত প্রাণের কূলে সে আহ্বানে জাগুক জোয়ার।

যে মহা জীবন ঘিরি' মুক্তির একাগ্র সাধনায়
মৃত্যুর দুরন্ত নেশা জেগেছিল পূর্ব্ব এশিয়ায়,
দিগ্‌বলয়ে মেঘে মেঘে বজ্রের নির্ঘোষে,

পর্ব্বতে অরণ্য-পথে
উঠেছিল মুক্তির আহ্বান,
এ তাহারি জন্মোৎসব ;
আজিকার এই পুণ্য দিনে
বিস্ময়ে স্মরণ করি'
শ্রুতকীর্ত্তি সর্ব্বাধিনায়কে
শ্রদ্ধা দিই, প্রীতি দিই
পাঠাই সাদর সম্ভাষণ,
যেথায় থাকুন তিনি
চিরঞ্জীব আজন্ম সংগ্রামী !

যে সংগ্রামে দেখিলাম
মানুষের মহতী সাধনা,
দুশ্চর্য্য তপস্যা অন্তে
মহামানবের আবির্ভাব,
মহা বীর্য্যে বলবান
করুণায় কুসুম কোমল,
অন্তরে গভীর ব্যথা
ব্যথাতুর মানুষের তরে ;
নাগপাশ উন্মোচনে
দীর্ঘ দুই শতকের শেষে
সংগ্রামী দাঁড়াল রুখি' চিরবৈরী ঘৃণিত তস্করে ।
অসংখ্য বাহিনী তার, অধীশ্বর অর্দ্ধ পৃথিবীর,
তারি সাথে সুরু হোল ভারতের মুক্তির সংগ্রাম

অপূর্ব্ব সে অভিযানে
সহযাত্রী অদম্য বাহিনী,
প্রাণে প্রাণে নব উন্মাদনা।
খণ্ড ছিন্ন ভারতের অখণ্ড সে অসংখ্য বাহিনী
যে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল ভারতের মুক্তি-সাধনায়,
সে সংগ্রাম থেমেছে কি ?
শেষ তার হয়েছে ইম্ফালে ?
দিল্লী ছিল বহুদূর—
এখনি কি এসেছে নিকটে ?

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে
কান পেতে শুনিয়াছি আমি
পরিচিত সেই কণ্ঠস্বর :—
—"দিল্লী চলো—দিল্লী চলো
এখনো অনেক পথ বাকী,
দুই ধারে গড়ে তোল নব পল্লী, নূতন বন্দর।"

সুভাষেরে জানি আমি
জানিয়াছি নেতাজী সুভাষে ;
জানি আমি আহ্বান তাহার ;
সে আহ্বান কতবার নিজ কর্ণে শুনিয়াছি আমি,
শুনিয়াছে সর্ব্বজন ভারতের মহাতীর্থ ভূমে।

তাহার আহ্বানে আছে
নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা ;
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তার
ভাসিতেছে আকাশে বাতাসে—
সংগ্রামের হয় নাই শেষ,
সফল হয়নি আজও
আমাদের স্বপ্ন ও সাধনা।

———

১৯৩৮—২৩শে জানুয়ারী

নেতাজীর জন্মোৎসবের পর

কোটি হৃদয়ের অনুরাগে রাঙা
রক্ত করবী ফুল,
সেই ফুলে গাঁথা সহস্র কোটি মালা,
উৎসব-সভা আলো-করা দীপ জ্বালা ;
চন্দন-ধূপে ভিতর বাহির
সুগন্ধ-সমাকুল—
তোমার পূজায় কোথায় হয়েছে ভুল ?
তুমি আসিলে না সে কি অভিমান ভরে'
বৃথাই কি তবে তোমার অর্ঘ্য সাজাইনু থরে থরে ?

সচকিত ছিল তব পথ চাহি'
কোটি কোটি নরনারী,
তাদের কণ্ঠে তোমারই জয়ধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠিল যে রণরণি,
কুটিরে কুটিরে প্রাসাদে সৌধে
দীপাবলী সারি সারি ;
কোথা অরণ্যে তুমি আজ পথচারী ?
পথের দিশারী অবিরাম চল কোন্ দুরান্ত পথে
সেথা কি তোমার যাত্রা হয়েছে আরম্ভ জয়রথে ?

আর কতদিন বল কতদিন
আত্মনির্ব্বাসনে
তপস্যা তব চলিবে রাত্রিদিন,
জানি জানি তব পরমায়ু ক্ষয়হীন,
তবু যে শঙ্কা মৃদু মন্থর
আসে বিহ্বল মনে,
তুমি ত এলে না এমন শুভক্ষণে!
মহাজীবনের বর্ষ-প্রবেশ নব জীবনের আশা
ভেবেছিনু আজ তোমার কণ্ঠে পাবে জীবন্ত ভাষা।

জয়-যাত্রার দুর্জ্জয় পণ
মানেনিক দুর্দিন,
সেদিন শঙ্খ বাজেনি যাত্রাকালে,
চন্দন-টিকা আঁকেনি তোমার ভালে,
সবারে এড়ায়ে বাহিরিলে পথে
দুর্দ্দম ভয়হীন;
ফিরে আসিবার আজও কি আসেনি দিন?
পদবিক্ষেপে ঘন অরণ্যে জাগিয়া উঠিবে পথ
সমুদ্র দিবে অনুকূল হাওয়া, শ্যামস্নেহ পর্ব্বত।

তাই ভাবি মনে তোমারে কে আজ
রুখিয়া দাঁড়াল আগে,
জাঙ্গাল বাঁধিল কোন্ সে দেশের রাজা
কোন ক্ষমতায় কে তোমারে দিবে সাজা?

তোমার মন্ত্র ঝড়ে বিদ্যুতে
সিন্ধু সরিতে জাগে,
তুমি ফিরিলে না তাই বিস্ময় লাগে!
আজ যদি তুমি সমুখে দাঁড়াতে এমন দুঃসময়ে;
প্রমত্ত ঝড় বুকে ঠেলে মোরা চলিতাম নির্ভয়ে।

১৯৪৮—৩০শে জানুয়ারী

একুশ সালের কথা

(কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের প্রতি)

একুশ সালের কথা
মনে পড়ে আজি আটচল্লিশে।
মনে হয় যেন মোর চোখের সম্মুখে
তোমরা বসিয়া আছ
চোখে মুখে উৎসাহের আলো,
মাদুর বিছান ঘরে
ছোট ছোট কাঠের চৌ-পায়া,
তারি 'পরে পুঁথিপত্র
কোথা'ও নাহিক আড়ম্বর,
"ফরবেস ম্যানসন"-এ তবু জেগেছিল যৌবন-জোয়ার
প্রাণের স্পন্দনে তার সুমধুর গতি-চঞ্চলতা ;
বিদ্যার্থীর মধুর গুঞ্জনে
বিদ্যাপীঠ মুখরিত উদ্‌ভাসিত নূতন আলোকে।

পরাধীনতার গ্লানি আজীবন দহিয়াছে যারে
প্রতীচ্চে যাহার কণ্ঠে উচ্চারিত তীব্র প্রতিবাদ
বিস্ময় জাগাল হেথা,
চাকুরী-সর্ব্বস্ব-প্রাণ বাঙালীর ঘরে
ভাবাবেগে হানিল আঘাত,

সে আনিবে নূতন প্রভাত
কলিকাতা বিদ্যাপীঠে ;
তাই তারে বসাইয়া গুরুর আসনে
দেশবন্ধু দীক্ষা দেন ; সে মোদের তরুণ সুভাষ।

সেদিন ছিলনা আলো, ছিলনাক আরাম বিলাস ;
বাহিরে উন্মত্ত ঝড়, ভিতরে উদ্দাম আলোড়ন ;
তারই মাঝে আমরা পেলাম
একটি জীবন ঘিরি' অনন্ত বিশ্বাস
অফুরন্ত উৎসাহের স্বপ্ন-ভাঙা উচ্ছল নির্ঝর।
প্রত্যাসন্ন আলোকের সম্ভাবনা কাঁপে থর-থর
হঠাৎ আলোর দেখা পেয়েছিলে তোমরা সকলে,
আমরা ছিলাম মাত্র আধার তাহার,
আমরা নিমিত্ত মাত্র, আমাদেরও তৃষিত নয়ন
সেদিনের অন্ধকারে আলোর সন্ধানে ফিরিতেছে ;
সেদিন দেশের ডাকে তোমাদেরি প্রথম পেলাম
অমাদের একান্ত নিকটে।
আমরা যখন আসি দাঁড়ালাম উন্মুক্ত প্রান্তরে
প্রথম সাক্ষাৎ হোল তোমাদেরি সাথে,
তোমাদেরি সাথে হোল জীবনের নব পরিচয়।
তোমাদের শ্রদ্ধার প্রণাম
সমস্ত অন্তর দিয়ে সে দিন গ্রহণ করিলাম ;

করিলাম আশীর্ব্বাদ—
জয়ী হবে তোমরা সকলে।
বিফল হয়নি জানি আমাদের সেই আশীর্ব্বাদ,
অধিকার লভিয়াছ মুক্তির উৎসব-সমারোহে,
সহজ আয়াস-লব্ধ সে উৎসবে আজ
অনাহুত নহত তোমরা,
তোমাদের তরে আছে দেশ-দেবতার আমন্ত্রণ
আমন্ত্রণ আমা সবাকার।

তোমাদের চেনেনাক যারা
তারা ত জানে না কোথা কোন দিন কাল-বৈশাখীতে
তোমাদের যাত্রা শুরু, দুর্গম বন্ধুর পথ বাহি'!
অবলুপ্ত দিবালোকে—বিষণ্ণ প্রদোষ অন্ধকারে
কোলাহল জেগেছিল,—উন্মত্ত অশান্ত কোলাহল
নিষ্ঠুর দস্যুর দলে ; অতর্কিতে নির্ম্মম আঘাত
সেদিন যাদের বক্ষে রেখে গেল শোণিতের লেখা,
তারা ত তোলেনি কণ্ঠে বেদনায় ভীরু আর্ত্তস্বর।
তখন আসেনি কাছে তারা ছিল ব্যস্ত নানা কাজে,
ফিরায়ে নিয়েছে মুখ, ডাকিলেও দেয়নিক সাড়া
বিলম্বিত প্রতীক্ষায় বুঝিয়াছি বিফল প্রত্যাশা।

নিশ্চিন্ত আরাম-কুঞ্জ মাঝে
তারা যে বাঁধিয়াছিল ছায়াসুপ্ত সুখময় নীড়।
বিস্রস্ত আলাপে মগ্ন কূজনে গুঞ্জনে আত্মহারা
তারা ত তোলেনি কানে সে রাত্রির ব্যর্থ হাহাকার।

যে রাত্রির অন্ধকার কালো হোল জমাট পাথরে,
যে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে ত্বরান্বিত ঝড়ের আবেগ,
দিগন্তে প্রান্তর-পথে আলোকের শেষ চিহ্নটুকু
যে রাত্রি মুছিয়া নিল বিস্তারিয়া অন্ধ যবনিকা,
তখন কোথায় তারা সে রাত্রির দুর্যোগ আহ্বানে ?
তারা কি জাগিয়াছিল ? ঘর ছাড়ি এসেছিল পথে ?
দুর্যোগ কাটিয়া গেছে, আলোকে পুলক জাগিয়াছে,
আজিকে নিকটে আসি তারা মত্ত উৎসব সভায়।

কোথা সে শ্রাবণ-রাত্রি কোথায় নীরন্ধ্র অন্ধকার,
পথের সঙ্কট নাই, দূর আজ হয়েছে নিকট,
নৃশংস দস্যুরও মনে জাগিয়াছে সম্প্রীতি-কামনা।
তারা ত জানে না কত দুঃখ ছিল সে দূর যাত্রায়,
কত ব্যথা বাজিয়াছে তোমাদের কোমল হৃদয়ে
কোন সে যাতনা বুকে হয়েছিল সে জন পাগল
সকলের তরে কেন সে সহেছে সহস্র আঘাত।

আমি জানি সে বৈরাগী বৈশাখের মত
ধূসর প্রান্তরে একা পেতেছিল ধ্যানের আসন
ঘর-ছাড়া তোমাদের নয়ন সম্মুখে
কাঁপিয়েছে স্তব্ধ দ্বিপ্রহর,
তোমাদেরি বেদনায় ব্যাকুল বৈকাল
জানায়েছে নিত্য আমন্ত্রণ ;

আশা ও প্রত্যাশা তাই
জাগিয়াছে রাত্রি শেষে নূতন দিনের কল্পনায়।

তোমরা চাহিয়াছিলে মেঘে মেঘে আগ্নেয় সংঘাত
চেয়েছিলে যুদ্ধের ইঙ্গিত,
স্থির সমুদ্রের বুকে আলোড়ন চেয়েছিলে সবে,
বিস্ফোরণ চেয়েছিলে পর্ব্বতের গুহায় গুহায় ;
তোমাদের সে প্রত্যাশা
আজি সূর্য্য-আলোকে স্পন্দিত,
তোমাদের আশা বহে জীবনের শ্যামল মহিমা।

মুক্তির উৎসবে আজ তোমাদের তাই নিমন্ত্রণ,
যুগের মহিমা-গর্ব্বে তোমাদের ক্ষুদ্র ইতিহাস
তোমাদেরই কৃতকর্ম্মে তাই র'বে দীপ্ত চিরন্তন।

১৯৪৮, ফেব্রুয়ারী

তুমি চেয়েছিলে ঝড়

তুমি চেয়েছিলে ঝড়
বজ্র-গর্ভ বিদ্যুৎ-স্ফুরণে
মেঘের গর্জ্জন সনে চেয়েছিলে বৈশাখের ঝড় !
রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর বিদীর্ণ মাটির স্তরে স্তরে
প্রত্যাশিত স্বল্প বৃষ্টি অকস্মাৎ এলনা নামিয়া ;
ঈশান কোণের মেঘ রুদ্ধ বেগে আকুল চঞ্চল
গতিপথে ঘনাইয়া ধূমায়িত অগ্নির কুণ্ডলী
সমস্ত আকাশ ছেয়ে দৃষ্টিপথ করি' অন্ধকার
এখনও এলনা কেন ? মধ্যপথে যাত্রা গেল থামি ?
কাল-বৈশাখীর আশা অপরাহ্ণ প্রতীক্ষার মাঝে
ব্যর্থ হোল প্রতিদিন,
প্রতিদিনই নবাঙ্কুরে সঞ্চারিত অস্ফুট বেদনা
বেদনা রাখিয়া গেল শত শত উন্মুখ পরাণে।

তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তাই দ্বিপ্রহর কাঁপে থরথর
ঘূর্ণিবায়ু ক্ষণে ক্ষণে বহি আনে ধূলির জঞ্জাল,
শুষ্ক জীর্ণ পত্রে হেরি প্রান্তরের রুক্ষ বিষন্নতা ;
মুকুল ঝরিয়া পড়ে, শস্যক্ষেত্রে ওঠে হাহাকার।
ছায়াছন্ন আম্রকুঞ্জে বৈরাগী বৈশাখ
রৌদ্রালোক পরিহরি পেতেছে আসন,
ধ্যানের আসন তার কেঁপে ওঠে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে।

দূরে—দূরে—বহুদূরে
তুমি কি ডাকিয়া গেলে হে সংগ্রামী, সমর-আহ্বানে ?
কাল বৈশাখীর তরে ধরণীর ব্যাকুল বিরহ
উষ্ণ বাষ্পে গুমরিয়া উঠিছে আকাশে
ছায়া পড়ে কাল-বৈশাখীর।
ক্ষণিক গর্জ্জনে আর পলকের বিদ্যুৎ স্ফুরণে
জেগে ওঠে ক্ষীয়মান আশা ;
কাল-বৈশাখীর তরে প্রত্যাশায় দীর্ঘ দিনমান
হঠাৎ চাহিয়া দেখে ঈশানে মেঘের বপ্র ক্রীড়া,
ক্ষণিকের সে মায়ায় তৃষ্ণা হয় আরও তীব্রতর ;
আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে নিরুদ্দেশ তোমার সন্ধানে।

বসন্ত ফিরিয়া গেছে দ্বার হোতে বিগত ফাল্গুনে,
বকুল বনের পথে পদচিহ্ন অভিযাত্রীদের,
ছিন্ন ভিন্ন মালিকার শুষ্ক ফুলে পদচিহ্ন রাখি'
এলে তুমি অগ্রসরি' অবহেলি' দখিনা পবনে।
পর্ব্বতে অরণ্য-পথে সে যাত্রার সমাপ্তি বেলায়
তুমি চেয়েছিলে ঝড়
উড়াইতে বিদ্রোহের বিজয়-কেতন,
ঝড়ের প্রমত্ত বেগে অগ্রগতি এ মহাজাতির
সন্ধিক্ষণে নব জাগরণ,
আগ্নেয় সংঘাতে তুমি চেয়েছিলে যুদ্ধের ইঙ্গিত,

অস্থির সমুদ্রে তুমি
চেয়েছিলে আরও আলোড়ন,
বিস্ফোরণ চেয়েছিলে পর্ব্বতের গুহায় গুহায়—
ধ্যানী যেথা ধ্যানমগ্ন তুষারে বল্মিকে লুপ্ত দেহ,
উপল খণ্ডের 'পরে ক্ষীয়মান বেগবতী নদী ;
সে ঝড় এল না হেথা জাগিল না অকালে বৈশাখ,
সংশয়ে বিষণ্ণ মন
প্রস্তুতির সে আহ্বান হইল বিফল,
তাই তব অভিযান নিস্তব্ধ প্রহরে
রেখে গেল ইম্ফালের বুকে
শহীদের রক্ত-স্নাত গৌরবের একটি প্রভাত।

সে ঝড় কোথায় আজ
দিগ্বলয়ে কোথায় ইঙ্গিত ?
ঝড়ের দুর্মদ বেগে
অগ্নিরথে তব আবির্ভাব
কবে হ'বে জানিনা'ক—
তবে শুধু এইমাত্র জানি
ঝড়ের নিরুদ্ধ বেগে সাধনার সকল প্রস্তুতি
আজিকে আসন্ন, শুধু দিন গণে তব প্রতীক্ষায়।

———

১৯৪৮, অক্টোবর

যদি আজ আসে শুভক্ষণ

তরুণের স্বপ্ন-মাখা নয়নে তোমার
দেখেছি প্রভাত সূর্য্য দিয়েছে আলোক
প্রতিদিন সহস্র শিখায় ;
রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের নিঃসীম আকাশে
যে কাহিনী লেখা আছে নিরবধি কাল
তুমি তাহা পড়িয়াছ উর্দ্ধে দৃষ্টি মেলি।
বিপুলা পৃথ্বীর বুকে মৌন মূক পাষাণের কথা
কান পেতে শুনিয়াছ পথে যেতে যেতে,
প্রতি পদক্ষেপে তব জেগেছে স্পন্দন
পথের ধূলায় আর উত্তপ্ত বাতাসে।

তুমি চাহ নাই শুধু দিবসের আলো
তোমার যাত্রার পথে পড়ুক নিয়ত ;
নিয়ত নির্বিঘ্ন হোক
নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্কেত ;
তুমি চাহ নাই কোনও দিবসের শেষে
গ্রামের সীমান্তে আসি অতিথি হইতে
আনন্দ-মুখর গৃহে, লভিতে বিশ্রাম ;
রাত্রির আরাম
সে-ত বন্ধু, নহে তব তরে।

ভাল বাসিয়াছ তুমি চলিতে একেলা
রজনীর অন্ধকারে আলোর সন্ধানে ;
অবারিত সূর্য্যালোকে করিয়া গাহন
কালো মেঘে আলোর সাধনা
সেই তোমা লাগে ভালো ;
ঝড়ে ও বিদ্যুতে স্তব্ধ মেঘান্ধ দিবসে
ক্ষান্ত নহে তব পরিক্রমা,
দুর্যোগ রাত্রির বিপর্য্যয়
তোমারে ডাকিয়া আনে পথে,
দুর্দ্দম চলার বেগে তুমি আন ডাকিয়া সঙ্কট ।

ভাল বাসিয়াছ তুমি অনন্ত চলার গতিবেগ
অশান্ত হৃদয়াবেগ, চিত্ত তবু শান্ত অচঞ্চল,
বিদ্যুতে বেসেছ ভাল, ভালবাস পূর্ণিমার চাঁদে
দিবসে বাসিয়া ভাল, ভালবাস রাত্রির আঁধার ।

এখনও তেমনি বুঝি অবিরাম চলিয়াছ বেগে
হেলায় উত্তরি বাধা
ব্যবধান দেশ ও কালের ;
ললাটে তেমনি দীপ্ত প্রভাতের ভাস্বর মহিমা
ভ্রূকুঞ্চনে মাঝে মাঝে ঝড়ের ইঙ্গিত দেখা যায়।
তোমারি তপস্যা লব্ধ রুদ্র দেবতার আশীর্ব্বাদ
সে যে বন্ধু, একান্ত তোমার ;

তাই তব কৃতাঞ্জলিপুটে
এখনও শোভিছে হেরি অর্ঘ্যশতদল
তরুণের স্বপ্নে রাঙা, প্রস্ফুটিত আম্লান সুন্দর !

আসিতেছ এই দিকে ?
শুভলগ্ন এল কি নিকটে ?
পূরব গগনে তাই হেরিলাম নব সূর্য্যোদয় ?
দূরপথে পদ শব্দ সে কাহার চিনিয়াছি, তাই
বাতাসে ভাসিয়া আসে বরাঙ্গের মধুর সুবাস।
পথের একান্তে বসি রাত্রিদিন গণেছি প্রহর
অধীর প্রতীক্ষা ভরে ;—যদি আজ আসে শুভক্ষণ
সে আনন্দে স্থির থেকো হে আমার উদ্বেল হৃদয়।

১৯৪১—২৩শে জানুয়ারী

তরুণের স্বপ্ন

ফাল্গুনী পূর্ণিমা নহে ; শারদ জ্যোৎস্নার মধুরিমা
আবেশ আনেনি চোখে ছিলনাক আলোর গরিমা,
তরুণের স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে অমাবস্যা রাতে।
দুর্যোগের অন্ধকার বিনিদ্র নয়ন-পাতে
দিয়েছিল ঢালি
দাসখতে স্বাক্ষরের সবাকার কলঙ্কের কালি
যুগ হ'তে যুগান্তে সঞ্চিত।
তোমার স্বপ্নের ঘোরে দেখিয়াছ আজন্ম বঞ্চিত
আমাদেরই ঘরে ঘরে লক্ষ কোটি প্রাণী,
তাদের অন্তরভরা দাসত্বের গ্লানি
প্রভুর চরণ প্রান্তে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম,
সে পরাজয়ের ব্যথা তোমার অন্তরে দেখিলাম
গুমরিছে দিবস শর্বরী ;
সে স্বপ্ন মধুর নহে। আপনা সম্বরি'
দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণায় যতখানি হয়েছ কাতর
তার চেয়ে বেশী অনাদর
পেয়েছ তাদেরই কাছে
যাহারা এখনও তব অন্তরেই আছে।

আমিও ত স্বপ্ন দেখি রাতে ;
প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রভাতে

দিবসের যোগসূত্রে অখণ্ড গ্রন্থির সমাবেশে
অন্তরাত্মা ওঠে হেসে ;
ভাবি মনে দিবারাত্রি এ স্বপ্ন-প্রয়াণ
কোন্ খানে নিয়ে যাবে ? কোথা পাব তোমার সন্ধান ?
নিদ্রিত এ নারায়ণে যদি আমি জাগাতে না পারি
বৃথা এ যন্ত্রণা ভোগ, আমি পথচারী,
পান্থশালা দিবে ঠাঁই কিম্বা তরুছায়া
অতিক্রান্ত পথশেষে হয়ত নশ্বর কায়া
শেষ হবে ; শেষ হ'বে দুঃস্বপ্নের ব্যথা
নয়ন-পল্লবে মোর স্থির হয়ে যাবে চঞ্চলতা।

রঙীন স্বপ্নের ঘোরে কভু আমি মুদি নাই আঁখি
দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণারে বক্ষে মোর লুকাইয়া রাখি'
তোমারে খুঁজিয়া ফিরি তুমি মোর নয়নের আলো
সে আলোর সাধনায় যদি মোর জীবন ফুরালো
কি তাহাতে আসে যায়
অসীম সমুদ্র বক্ষে তরঙ্গ ত এমনি মিলায়।

১৯৪১—সেপ্টেম্বর

জোয়ার

ভয় কা'রে বলে তুমি তা' জান না
কাহারে তোমার ভয়,
মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করি'
করেছ মৃত্যু জয়।
দুর্যোগে যা'র যাত্রা হয়েছে সুরু
মাথার উপরে আষাঢ় মেঘের গর্জ্জন গুরু গুরু,
বিদ্যুতে যা'র আঁধার পথের
শেষ হ'ল সংশয়,
পায়ে চলা পথে সহজে সে চলে
পাথেয় করে না ক্ষয়।

তাই ভাবি মনে যে পথ তোমার
থেমেছিল ইম্‌ফালে,
সেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন
মুছিবে না কোনও কালে;
সেথা হ'তে পথ তোমার চলার আগে,
নিজেরে মেলিয়া দিবস রাত্রি আগ্রহ ভরে জাগে;
কিসের বিঘ্ন, কিসেরই বা বাধা
কোথায় অস্ত্রশালে
তোমারে আঘাত হানিবে বলিয়া
হাপরে অগ্নি জ্বালে?

জ্বলন্ত তলোয়ার

দমকা হাওয়ায় 'নেহাই' এর বুকে
অসংখ্য শিখা জ্বলে
রুদ্ধ বাষ্প তাতিয়া তাতিয়া
রুক্ষ মাটির তলে
জ্বালাইয়া দিবে বিঘ্নের প্রতিরোধ
শত্রুর মনে অনুতাপানলে জাগিবে আত্মবোধ ;
অভী মন্ত্রের চির উপাসক
আপনার বাহু বলে
ফিরে এস তুমি সেই পথ দিয়া
যে পথে গিয়াছ চলে।

দিবসের আলো ভিখারীর মত
কর নাই প্রার্থনা,
রাত্রি-আঁধারে তপস্যা তব
ছিলে অনন্যমনা ;
আগামী দিনের আশায় সমুৎসুক
বজ্রের বাঁশী তোমারে সদাই রেখেছিল উন্মুখ,
সে বাঁশীর সুরে আজি তোল তুমি
জীবনের মূর্চ্ছনা,
জোয়ার আসিছে মরা গঙ্গায়
ভাসাতে আবর্জ্জনা।

১৯৪৯—সেপ্টেম্বর

পূর্ণাহুতির এইত সময়

প্রাচী-দিগন্তে আবার কি জ্বলে
জ্বলন্ত তলোয়ার
ছিল মেঘে ঢাকা, অথবা নিহিত
পর্ব্বত গুহাতলে,
অমাবস্যার ঘনান্ধকারে
উগ্র সে সাধনার
ঘন গম্ভীর মন্ত্রের ধ্বনি
বাতাসে ভাসিয়া চলে।

বুঝেছি বুঝেছি সাগরের জলে
ডুবেনিক' তলোয়ার;
শত্রুর হাতে হয়নি প্রোথিত
মৃত্তিকা গহ্বরে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া অন্তর-দাহে
হইয়াছে ক্ষুরধার
এই বসুধার সকল ক্ষুধার
যন্ত্রণা বুকে ধ'রে।

নূতন সমিধে হোমের অনল
আবার জ্বলিল কিরে,
যজ্ঞধূমের কুণ্ডলী ওঠে
উর্দ্ধ আকাশ পানে,
ধ্যানের আসনে নয়ন মেলিয়া
মহাসাগরের তীরে
যেন কে হেরিছে প্রমত্তলীলা
মুক্তির অভিযানে।

গিরি কন্দরে গোপন সাধনা,
মরুযাত্রার শেষে
পন্থবিহীন ঘন অরণ্যে
কণ্টকে ক্ষত দেহ,
বর্ম্ম ত্যজিয়া গৈরিক বাসে
সে কি সন্ন্যাসী বেশে
দূর দুরান্ত পার হয়ে গেল,
দেখিতে পেল না কেহ ?

আবার আকাশ মেঘে ঢেকে গেল
আঁধার ঘনায়ে আসে
দিশাহারা পথে নরনারী যেন
ছোটে উন্মাদ হয়ে,

সূর্য্যের আলো মুছে নিয়ে গেল
রাহু কি সর্ব্বগ্রাসে,
পূর্ণাহুতির এইত সময়
লগ্ন না যায় বয়ে।

স্বর্গের জ্যোতি আননে তাহার
নয়নে দিব্য বিভা
কুঞ্চিত ভালে নিরুদ্দেশের
যাত্রার প্রস্তুতি,
কণ্ঠে তাহার মাতৃমন্ত্র
ধ্বনিছে রাত্রিদিবা
হেথা হবিত্রী তৃষার্ত্ত আজি
কোথায় পূর্ণাহুতি?

১৯৪১—সেপ্টেম্বর

জয় হিন্দ

অবিস্মরণীয়

সর্ব্বাধিনায়ক (সোনান)

জেল হইতে ফিরিয়া সুভাষচন্দ্র দেখিলেন রায়বাগান ষ্ট্রীটে তাঁহার বহু সাধের কলিকাতা বিদ্যাপীঠ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত জ্বলিতেছে—বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়াছে—বিপ্লবী, জেল-ফেরত কংগ্রেসীদের এই কলেজ আর সেবাড়ীতে রাখিতে দিবে না।

সুভাষচন্দ্র বিদ্যাপীঠের জন্য বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন—সঙ্গে বর্ত্তমান লেখক। বিডন ষ্ট্রিটের মোড় হইতে এস্‌প্লানেড্ পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া আসা গেল;—পথে আসিতে আসিতে যতগুলি লোক হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাহিল সুভাষচন্দ্র একে একে সকলকেই যাহা হাতে উঠিল তাহাই দিয়া দিলেন। ধর্ম্মতলার মোড়ে টিপুসুলতানের মস্‌জিদের নিকট একটি স্ত্রীলোক ঘোমটার ভিতর হইতে বলিল,—"স্বামীর অসুখ,—ছেলের অসুখ, ফুট্‌পাতে শুইয়ে রেখেছি—বড্ড জ্বর, কেমন ক'রে বাড়ী ফিরব বাবা?"

সুভাষচন্দ্র পাঞ্জাবীর পকেট হাতড়াইয়া একটা সিকি মাত্র পাইলেন,—আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"এতে ত রিক্‌স্ ভাড়া হবে না,—কিছু আছে?" আমি একটা আধুলি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম।—

"ট্রামে না চড়ে হেঁটে গেলে হয় না?"—সুভাষচন্দ্রের এ কথা বলার তাৎপর্য্য বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না;—অর্থাৎ নিজের পকেট শূন্য, আমার কাছ হইতে বোধ হয় তিনি আর কিছু লইতে চাহেন না।—বলিলাম,—"এই আট আনা, আর ট্রাম ভাড়া যা' লাগে একসঙ্গে কাল শোধ ক'রে দেবেন। ধার রাখা উচিত নয়—বিশেষ বন্ধুদের কাছে।"

সুভাষচন্দ্র হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।—বলিলেন—"আচ্ছা, আজ তেওতা থেকে কিরণ বাবুর ফেরার কথা—চলুন না, সেখান হয়ে যাওয়া যাবে—আপনি বাসায় চলে যাবেন—আমি একলাই বাড়ী ফিরবখন, আপনাকে আর এল্‌গিন রোড পর্য্যন্ত কষ্ট দেব না।"

ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে কিরণবাবুর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গল্পগুজব করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

উঠিবার সময় সুভাষচন্দ্র কিরণবাবুকে বলিলেন—"বাড়ী পাওয়া দুষ্কর—বিদ্যাপীঠ স্থানাভাবে উঠে গেলে বড় লজ্জার কথা হবে।"

কিরণবাবু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"দেশসেবা আর মা সরস্বতীর সেবা একসঙ্গে চল্‌বে না, এ আমি ভেবে দেখেছি। ওটা এখন মুলতুবী থাক। আগে স্বাধীনতা পাই, আপনাকে আবার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল না ক'রে ছাড়চি না। মনের সাধে তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে, বিদ্যা দান করবেন। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

কিরণবাবুর কথায় সুভাষচন্দ্র যেন ক্ষুণ্ণ হইলেন। কোনও উত্তর দিলেন না—তাহা ছাড়া কোনও ঠাট্টা তামাসার কথা তিনি তখনই তখনই বুঝিতে পারিতেন না বা বুঝিবার চেষ্টাও করিতেন না। মন যেন তাঁহার সর্ব্বদা অন্তস্তরে ডুবিয়া থাকিত। অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও তিনি বৃহৎ করিয়া দেখিতে অভ্যস্থ ছিলেন। হাস্য পরিহাস যেন যেন তাঁহার ধাতে সহিত না।

কিরণবাবু এবার একটু গম্ভীরভাবেই বলিলেন,—"দেখুন, কংগ্রেস অফিসের ভাড়া আজ ক'মাস ধ'রে বাকি পড়ে আছে। দেশবন্ধুর মত লোক টাকা তুলতে হিম্‌শিম্ খেয়ে যাচ্ছেন—বিদ্যাপীঠের জন্য বাড়ী পেলেও তার ভাড়াটা যোগাবেন কোথা থেকে?"

—সুভাষবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিরণবাবুর ইঙ্গিত তাঁহার ভাল লাগিল না। ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন হইতে ধর্ম্মতলার ট্রাম লাইন পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্র একটি কথাও বলিলেন না;—বিদ্যাপীঠের বাড়ীর চিন্তা অথবা ভবিষ্যতের অন্যকোনও আশঙ্কায় তখন তাঁহাকে যেন চিন্তান্বিত দেখিলাম কিন্তু কি সে চিন্তা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।—"চলি" বলিয়া সুভাষচন্দ্র ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। মোড় ফিরিতেই আমার মনে হইল, তাঁহার কাছে ত ট্রামের ভাড়া নাই—কন্‌ডাকটর টিকিট চাহিলেই সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িবেন। একবার এই রকম হইয়াছিল। বিডন ষ্ট্রীট হইতে একবার আমার সঙ্গে হাঁটিয়া আসিয়াছেন—আবার এলগিন রোড পর্য্যন্ত তিনি হাঁটিয়াই যাইবেন। মনটা অস্বস্তি ও অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল।

কলিকাতা বিদ্যাপীঠ তখন উঠিয়া গিয়াছে;—ছাত্রগণ দলভ্রষ্ট,—অভিভাবকেরা তাহাদের ভালচোখে দেখেন না, অনেকে নিজের বাড়ীতেই সে সময় স্থান পায় নাই। সে আজ প্রায় ছাব্বিশ বছর আগেকার কথা। এখন ছাত্রদের মন মেজাজ কালের প্রভাবে তৈরী হইয়া গিয়াছে। আজ দেশের কাজ করিয়া ছেলে বাপ-মায়ের সমর্থন পায়; সন্তানের আত্মত্যাগে বাপ মায়ের আনন্দ হয়। ছেলেমেয়েদের মন আজ দেশমুখী। এ মন কিন্তু একদিনে প্রস্তুত হয় নাই; এ প্রস্তুতির পিছনে বহু সাহস, বহু ত্যাগ, বহু নির্য্যাতন, বহু কারাবরণ ও মৃত্যুবরণ আছে। নিজের একমাত্র সন্তান অন্তরীণে বা কারাগারে, অথবা পর পর একাধিক সন্তানের কারাভোগ বা দিবারাত্র গোয়েন্দা পুলিশের গোপন পাহারা, ইহাতে সেকালের ব্রিটিশ সমর্থক মনও ক্রমশঃ ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিল বাংলা দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছি—তখন মনের এ পরিবর্ত্তন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

'ফরওয়ার্ড' অফিস তখন ধর্ম্মতলা হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে—কিছুদিন পরে কুখ্যাত একটি মামলার দায়ে 'ফরওয়ার্ড' 'লিবার্টি' হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিল।

বিদ্যাপীঠের বহু ছাত্রকে সুভাষচন্দ্র এই কাগজের অফিসে কাজে লাগাইয়াছিলেন—একেবারে অবৈতনিক নহে।—"ফরওয়ার্ড" প্রেসের ম্যানেজার হিসাবে আমার এবং জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে সুভাষচন্দ্রের মাসিক দক্ষিণা নির্দ্দিষ্ট ছিল ৬০৲ টাকা—এই মেকদারে সকলেই কিছু না কিছু পাইত। কলিকাতা বিদ্যাপীঠেও এই পরিমাণ দক্ষিণার ব্যবস্থা ছিল—কেহ তাহা লইতেন কেহ বা লইতেন না।

ঠিক এই সময়ে বিদ্যাপীঠের "উপাধি" শ্রেণীর ছাত্র পরেশ চাটার্জ্জি (ইনি এখন কলিকাতার একজন কৃতী ব্যবসায়ী) কুমিল্লা হইতে সরাসরি সুভাষচন্দ্রের কাছে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল ছিল কিন্তু তাঁহার প্রতি অভিভাবকদের মনের তৎকালীন অবস্থা অত্যন্ত বিরূপ, ছাত্রটিও আদর্শবাদী ও তেজস্বী ছিল বলিয়া নিজের পথ তিনি নিজেই দেখিয়া লইবেন মনে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"লিবার্টি" কাগজের অবস্থা তখন ভাল নয়—কাজেই কোনও কাজের মধ্যে আর কাহাকেও নিয়োগ করা তখন একপ্রকার অসম্ভবই ছিল। শরৎচন্দ্র ব্যারিষ্টারির অনেক টাকা এই কাগজের জন্য ব্যয় করিয়াছেন কাজেই কাগজের ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের কুণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পরেশ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়াই শুধু নহে বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সুভাষচন্দ্র নিজের বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিই ছিল এইরূপ।

তিনি বলিলেন,—"তুমি কাজে লাগো,—তোমার নিজের খরচ চালানর মত টাকা আমি নিজেই জোগাড় করে দেব।"

ছাত্রটির আত্মসম্মানে বুঝি আঘাত লাগিল, তিনি অভিমান ভ'রে বলিলেন—

"আপনি জোগাড় করে দেবেন? তার মানে? আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে কাগজ থেকে যদি আমি টাকা না পাই—অন্য কোনও ভাবে সংগৃহীত কোনও টাকা আমি নিতে যাব কেন?"

দুই একটি কথা বলিয়া সুভাষচন্দ্র কথাটার মোড় ঘুরাইতে বৃথাই চেষ্টা করিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকার পর বলিলেন—"আচ্ছা, বিদ্যাপীঠ উঠে গেছে ব'লে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও কি মিটে গেছে? আমি কি তোমাদের কেও নই? আমাকে এমন পর ভাব কেন?"

ছাত্রটি ইহার উত্তরে কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু দুঃখে ও অভিমানে আরক্ত সুভাষচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়া গেলেন।

ছাত্রটি আর কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। কাজে লাগিয়া গেলেন।

ছাত্রদের মধ্যে অভাব অভিযোগ থাকিলে তাহা মিটাইতে সুভাষচন্দ্র এত ভালবাসিতেন যে পরের কাছে সেজন্য হাত পাতিয়া টাকা লইতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেন না। বিদ্যাপীঠ উঠিয়া গিয়াছে ইহা যেন একমাত্র তাঁহারই অপরাধ,—ছাত্রদের স্থিতি করিয়া দিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য যেন একমাত্র তাঁহারই—এই চিন্তাতেই তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন।

বাংলা দেশের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস—সারাটি দিন বেজায় গুমোট! আকাশ মেঘ-ভারাক্রান্ত কিন্তু বর্ষা ঠিক তখনও নামে নাই। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ম্বর আছে কিন্তু বর্ষা রীতিমত আরম্ভ হয় নাই—। আকাশের একদিকে খানিকটা কালো মেঘ জমাট হইয়া আছে—দেখিলে আশঙ্কা হয় হয়ত সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামিতে পারে।

অনেকটা দূর কাঁচা রাস্তা হাঁটিয়া সুভাষচন্দ্র নৌকায় চড়িয়া বসিলেন। সঙ্গে কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী।

পদ্মা নদীর মাঝি,—বয়স হইয়াছে কিন্তু দেখিলে মনে হয় এখনও বেশ শক্তই আছে; মুখে অনেক ঝড় ঝাপটার চিহ্ন।

মাঝি বলে—"কর্ত্তা, একটু সবুর করে গেলে হয়না?—ছামোর মেঘ।" কর্ত্তাটির সঙ্গে পূর্ব্ব পরিচয় থাকিলে মাঝি কখনই এমন অবান্তর প্রশ্ন করিয়া বসিত না।

সুভাষচন্দ্র হাসিয়া উত্তর দেন—"কেনহে, ভয় লাগে নাকি?"

মাঝি বলে—"না কর্ত্তা, আমাদের কাজইত এই; তুফানের সঙ্গে লড়াই ক'রে আমরা নদী পার হই, ভয় আমাদের লাগেনা,—ফুর্ত্তিই লাগে। তবে আপনারা যাবেন কিনা, তাই। আমার আর কি?"

সুভাষচন্দ্র বলেন—"তুফান? বেশ ত! তুমি নিশ্চয়ই তুফানে নৌকা বেয়েছ?"

মাঝি উত্তর দেয়—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কর্ত্তা!"

"কখনও নৌকাডুবি হয়েছে?"—জিজ্ঞাসা করেন সুভাষচন্দ্র।

"কম হলেও দু'তিন বার, কর্ত্তা।"—উত্তর দেয় পদ্মা নদীর মাঝি।

—নৌকা তখন কূল ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে।

মাঝি ব'লে—"একবার,—হেই আল্লা!"—মাঝির মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। মাথা নীচু করিয়া সে দাঁড় টানিয়া চলে।

সুভাষচন্দ্র বিস্মিত হইয়া মাঝির মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

মাঝি ব'লে—"জোয়ান ছেলেটাকে এই পদ্মার বুকেই দিয়েছি কর্ত্তা।" সুভাষচন্দ্রের চোখ দুইটি আর্দ্র হইয়া আসে। সেই মেঘলা দিনের অস্পষ্ট আলোকেও সুভাষচন্দ্রের আরক্তিম মুখের বিষণ্ণ ছায়া চোখে পড়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর তিনি প্রসঙ্গান্তরে আসিবার চেষ্টা করেন।

"যেতে আমাদের কতক্ষণ লাগ্‌বে মিঞা ?" —প্রশ্ন করেন সুভাষচন্দ্র।

মাঝি বলে—"আন্দাজ তিন চার ঘণ্টা।"

"তা'হলে বৃষ্টি নামার আগেই আমরা পৌঁছে যাব ;—কি বল ?"—বলেন সুভাষচন্দ্র।

মাঝি ততক্ষণে বোধহয় পুত্রবিয়োগের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে। সে একটু হাসিয়া ব'লে—"হুইযে, গোপালতলীর ঘাট, ওই ঘাটে নেমে যেতে হয় আমার শ্বশুর বাড়ী।"

নৌকা তখন হেলিয়া দুলিয়া পদ্মা নদীর খর তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।—তরঙ্গভঙ্গ তাহাকে না বলা গেলেও ভঙ্গীটা তাহার যে বেশ শান্ত একথা বলা যায় না। ঝড় উঠিলে ঢেউ এর মাতন আরম্ভ হইতে বিলম্ব ঘটিবে না ইহা বেশ বুঝা যায়।

আরোহীদের একজন জিজ্ঞাসা করে—"মাঝি, তুমি সারি গান জান ?"

"জানতাম বাবু,—কিন্তু বয়স হয়েছে—এখন গলায় আর থৈ পাই না।"—উত্তর দেয় মাঝি।

মাঝি চুপ করিয়া থাকে, কথা বলে না ; সুভাষচন্দ্রের গম্ভীর চেহারা দেখিয়া হয়ত সে সমীহ করে। সেটা সুভাসচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় না।

তিনি বলেন—"লজ্জা কি হে, গাও না ? আমি গান খুব ভালবাসি।"

মাঝি প্রাণে ভরসা পায় ; গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া গাহিতে আরম্ভ করে—

"নদীর মর্ম্ম জানতে হ'লে
গহীন জলে নাম্‌তে হয় ;

নিতলে তুই ডুববি যদি
তুফানে তোর কিসের ভয়।
নদী যদি দুকূল ভাঙ্গে
বান ডাকে তোর মরাগাঙে
দূরের পাল্লা দিতে হ'লে
কভু উজান বাইতে হয়।"

অবিরাম নৌকা চলিয়াছে। মাঝির গান কখন যে শেষ হইয়া গিয়াছে কাহারও সে খেয়াল নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু শোনা যায়—দাঁড় ফেলার শব্দ—ছপ্ ছপ্ ছপ্। ঢেউগুলি নৌকার দুইধারে আছড়াইয়া পড়িতেছে—তাহারই শব্দে সৃষ্টি হইতেছে একটি একটানা শব্দ—ছলাৎ ছল—ছলাৎ ছল।

পিছনের গ্রামগুলি ছোট, দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ আরও ছোট হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—বাংলার শ্যামায়মান বনশ্রীতে দিগন্তব্যাপি একটা স্বপ্নের মোহ নামিয়া আসে। নিস্পন্দ দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র চাহিয়া আছেন সম্মুখের দিকে,—কোথায় তাঁহার লক্ষ্য? দূরে, বহুদূরে, নদীর পরপারে, গ্রামের সীমারেখা ছাড়াইয়া কোথায় কোন চরম লক্ষ্যের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ? প্রস্তর-কঠিন নিশ্চল মূর্ত্তি,—দৃষ্টি উদাস—কিন্তু মন যেন উদাসীন নয়—কি যেন তিনি একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছেন। এমন মানুষের সান্নিধ্য লাভ করা সত্যই লোভনীয়। তাঁহার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্বে অভিভূত হইয়া পড়িবার একটা বিশিষ্ট আনন্দ আছে।

মেঘ তখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। কালো মিশমিশে মেঘের রঙে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে পদ্মানদীর অগণিত তরঙ্গ মালা;—'সাপ খেলান বাঁশী'র সম্মুখে অসংখ্য অজগরের মত।

সুভাষচন্দ্র নৌকার সেই অসহনীয় স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—

"তোমরা কেও শ্যামাসঙ্গীত জান?"

সকলের হইয়া একজন উত্তর দিল—"না।"

"জান্‌লেও তোমরা কেও গাইবে না, সে আমি জানি। এমনি মেঘের আলোড়নের মধ্যে শ্যামা সঙ্গীত খুব ভাল লাগে আমার। তোমরা যখন গাইবে না, তখন আমাকেই গাইতে হ'বে।"

গুণ গুণ করিয়া সুভাবচন্দ্র গান ধরেন—সকলে বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে। সুভাষচন্দ্র ততক্ষণে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—

"কবে আবার নাচবি শ্যামা
মুণ্ডমালা দুলিয়ে গলে,
ওই, কালো মেঘের অন্ধকারে
তোর হাতের খড়্গ উঠুক জ্বলে।
মা তোর ত্রিনয়নের বহ্নিশিখায়
ছাই করে দে মনের কালি,
আমি ভয়ঙ্করে করব না ভয়
তুই, অভয় মন্ত্র দে মা কালী।
ওমা, বারে বারে ডাক্‌ব তোমায়
মা হয়ে পালাবি কোথায়
এবার রাঙা জবার অর্ঘ্যমালা
দিব মা তোর চরণ তলে।"

—নৌকা গ্রামের ঘাটে লাগিতেই দেখা গেল—বহুলোক সেখানে সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, গ্রামের প্রধান পক্ষেরা এবং জনসাধারণ সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া গ্রামের মধ্যে লইয়া গেলেন।—সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের মুখে কিন্তু কোনও কথা নাই।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থের আদর অভ্যর্থনা ও অতিথি সৎকারের আয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একজন দরিদ্র মুসলমান কংগ্রেস কর্ম্মীর আটচালা ঘরে তিনি উপযাচক হইয়া অতিথি হইলেন।

সকালে গ্রাম্যস্কুলের সংলগ্ন মাঠে সভা বসিয়াছে; হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে নরনারী ও শিশু ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—এমনই প্রিয়দর্শন যুবক সুভাষচন্দ্র—তাঁহাকে দেখিলে চোখ ফিরাইতে পারা যায় না। এমন ধীর স্থির মিষ্ট কথাও তাহারা জীবনে বোধ হয় শুনে নাই। স্কুলের ভাঙ্গা বেঞ্চগুলি সাজাইয়া সভা বসিয়াছে,—সভাপতি সুভাষচন্দ্র।—তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া

মনে হয় তিনি যেন আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্র রচনা করিতে বসিয়াছেন। অতি সামান্য বস্তুকে সুভাষচন্দ্র এমনি নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত গ্রহণ করিতেন—অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারকেও মহৎ সম্ভাবনার কল্পনায় তিনি এমনি বড় করিয়া দেখিতেন।

গ্রাম সংগঠন, পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা, কুটীর শিল্প উন্নয়ন, স্ত্রীশিক্ষা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্যরক্ষা কোনও বিষয়ই তাঁহার বক্তৃতায় বাদ পড়িল না!

তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার সার কথা ভারতের মুক্তির জন্য অবিরাম আপোষ-হীন সংগ্রামের উদ্যোগ। অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীর ক্ষুদ্র সভায় তিনি সেদিন যে বাণী শুনাইয়াছিলেন—মুক্তি-সংগ্রামের বৃহত্তর পরিবেশেও সেই কথাই বারবার তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব এশিয়ার ঘুম তাহাতে ভাঙ্গিয়াছিল—ভারতের ঘুমও এতদিনে ভাঙিয়াছে। কিন্তু সেই ঘুম-ভাঙান মন-জাগান যাদুকরের দেখা কি আমরা আর পাইব না?

রেঙ্গুন সহর হইতে কিছুদূরে সেগুন বনের একধারে অনেকগুলি সমতল জায়গা জুড়িয়া আজাদ হিন্দ বাহিনীর ছাউনী পড়িয়াছে। ঠিক মধ্যস্থলে একটি ক্যাম্প নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু তখন সেখানে তিনি নাই। ক্যাম্পের দরজায় দুইজন শান্ত্রী পাহারা দিতেছে—ক্যাম্পের ঠিক পশ্চাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের গোয়েন্দা বিভাগের তাঁবুগুলি এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে হঠাৎ বুঝিবার উপায় নাই যে সেখানে কোনও অফিস আছে, বা লোকজন খাতাপত্র ফাইল লইয়া মনোযোগসহকারে সংগোপনে কাজকর্ম্ম করিতেছে। সেই বিরাট ছাউনীর মধ্যে সেদিন যেন লোকজনের তৎপরতা কিছুটা বেশী মনে হইতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়—এখনি ফৌজের ডাইনিং হ'লে খাবারের ঘণ্টা পড়িবে। এমন সময় ছাউনীর মাঝখান দিয়া যে পাকা রাস্তাটি ছাউনী ছাড়াইয়া দূরে বহুদূরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তা দিয়া—একখানি Weapon Career বা অস্ত্রশস্ত্র-বাহী ট্রাক্ আসিতেছে মনে হইল।

তাহার সম্মুখে দুইটি সাদা নিশান উড়িতেছে, দেখিলে মনে হয় নিশানগুলি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেকটা বড়।

ভারী গলায় (কমাণ্ড) আদেশ হইতে শোনা গেল—"সাবধান"—ফৌজদলের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল; যে যেখানে আছে, position লইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া গেল—সকলেই প্রস্তুত। মনের মধ্যে সকলেরই কৌতূহল জাগিয়া উঠিল কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের একমাত্র লক্ষ্য ভারতবর্ষের মুক্তি—সেখানে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলার কড়া শাসনে আকস্মিক ঘটনাও প্রত্যেকের ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে ট্রাকখানি একেবারে ছাউনীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল—সেনাদলের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় অফিসার কাছে আসিতেই, দুইজন ব্রিটিশ সামরিক পোষাকপরা 'অফিসার' অভিবাদন করিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল তাহারা নিরস্ত্র।

ততক্ষণ নেতাজী হাসপাতালের সুব্যবস্থা চোখের সম্মুখে পাকাপাকি দেখিয়া নিজের ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর অফিসার দুইটির সঙ্গে আজাদ হিন্দের অফিসারদের কথা হইবার পর—নেতাজীর সেক্রেটারীর কাছে টেলিফোন করা হইল। তিনি অফিসার দুটীকে নেতাজীর ক্যাম্পে লইয়া আসিবার নির্দ্দেশ দিলেন।

"জয় হিন্দ" বলিয়া নেতাজীর সম্মুখে অফিসার দুইটি অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল—! নেতাজী প্রত্যাভিবাদন করিলেন।..... ক্যাপ্টেন বলিল—"আমরা অনুতপ্ত, ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর আমি একজন ক্যাপ্টেন—ইনিও ক্যাপ্টেন কিন্তু সামরিক হাসপাতালের ডাক্তার। আমরা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নিজেদেরকে উৎসর্গ করিতে চাই। আপনি আমাদের পূর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা করিয়া যদি আশ্রয় দেন—আমরা কৃতার্থ হই।"

আবার তাহারা অভিবাদন করিয়া attention হইয়া দাঁড়াইল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাহাদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া মৃদুহাস্য করিলেন; তাহার পর বলিলেন—

"Are you serious ?—really repentant of what you have so far done ? This is not a child's play—here, you won't

get what you used to get in the British Army. Hunger, privation, trials and tribulation are what I can offer you. Are you prepared to accept them ? You wo'nt mind them, I belive, if you mean what you say."

অর্থাৎ : একথা কি সত্য ? সত্যই কি তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার জন্য অনুতপ্ত ? এটা ছেলেখেলা নয়—আগে ব্রিটিশ বাহিনীতে যেরূপ সুখ সুবিধা পাইয়া আসিয়াছ—এখানে তাহা পাইবে না। ক্ষুধা, সর্ব্বরকমের ত্যাগ স্বীকার, নানা রকম পরীক্ষা, দুঃখ কষ্ট—ছাড়া এখানে অন্য কিছু নাই। প্রস্তুত আছ ? যাহা বলিতেছ তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস এ সকলে তোমাদের কিছু যাইবে আসিবে না।

"Yes Sir"—হাঁ মহাশয়—দুই জনেই একই সঙ্গে এই কথা বলিয়া—সামরিক কায়দায় দাঁড়াইয়া থাকিল।

নেতাজী বলিলেন—"তথাস্তু।"

ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে তাহাদের যে পদবী ছিল—তাহারা তাহার নিদর্শন দেখাইল। "আর্মি বুলেটিনে' ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের স্বাক্ষরিত ঘোষনায় প্রকাশ পাইল যে উক্ত দুইজন অফিসার (deserter) দলত্যাগী, বিশ্বাস ঘাতক (traitor); তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে পারিলে একটা মোটা রকমের পুরস্কারের প্রলোভনও তাহাতে দেখান হইয়াছে—এবং সে কাগজ যে-কোনও ভাবেই হউক আজাদ হিন্দ বাহিনীর দপ্তরে নথিভুক্ত হইয়া গেল।

অফিসার দুইজন ব্রিটিশ সেনা বাহিনী হইতে বহু কষ্টে অর্জিত পদবী হইতে বঞ্চিত হইল না—সামরিক কাজ কর্ম্মের যে ভার তাঁহাদের উপর অর্পিত হইল তাহাও দায়িত্বপূর্ণ।

কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর রহিল এই দুই অফিসারের উপর। নেতাজী নিজে তাহাদের গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখিতেন কিনা তাহা কেহ জানিল না,—তবে প্রচলিত নিয়ম কানুন অনুসারে তাহাদের উপর কড়া নজর রাখিল আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্ত পুলিশ বিভাগ। এইভাবে পক্ষকাল চলিল।

আগে হইতে সাক্ষাৎকারের কথা না জানাইলে এবং অনুমতি না পাইলে সর্ব্বাধিনায়কের সহিত দেখা করিবার রীতি নাই। এ নিয়ম সাধারণ সৈনিক হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ পদস্থ সেনা-নায়কের মধ্যে কাহারও অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। কিন্তু সেদিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা গেল।

সে দিন অপরাহ্ন পাঁচটার সময় হইতে আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা দিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর ছাউনী তখন রেঙ্গুন সহরের উপকণ্ঠে কিছুদিনের মত কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। একটি দ্বিতল গৃহের একতলায় সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্রের কেন্দ্রীয় সামরিক দপ্তর—উপরের তলায় তিনি নিজে থাকেন। একটি সুবৃহৎ হল ঘরের দেওয়ালে অসংখ্য মানচিত্র টাঙ্গান,—বিশ পঁচিশটি কাঠের আলমারী সামরিক বিজ্ঞানের পুস্তকে ভরা। শয়ন কক্ষে একখানি খাটিয়া,—অতি সামান্য বিছানাপত্র; আর একখানি পোষাক পরিবার ঘর। ড্রয়িং রুম বা সাক্ষাৎকারের জন্য নির্দিষ্ট ঘর নীচের তলায়।

নেতাজী তখন চা পানের পর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একখানি বৃহদাকার পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন আর মাঝে মাঝে দেওয়ালে টাঙান একখানি মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন।

অতি সম্ভ্রমে হয়তবা ভয়ে ভয়ে তাঁহার সেক্রেটারি ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন, অন্যমনস্ক ভাবে একটি সিগারেট ধরাইয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

সেক্রেটারি বলিলেন—"ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হইতে আগত সেই ক্যাপ্টেন দুইজন আপনার সহিত দেখা করিতে চান—"

অবিচলিত ভাবে নেতাজী উত্তর দিলেন—"ইহাত' আমার সাক্ষাৎকারের সময় নয়।"

সেক্রেটারী: "তাহারা নাছোড়বান্দা—নেতাজীর সহিত তাহারা দেখা না করিয়া নড়িবে না।"

নেতাজী: "তাহারা কি নিয়ম কানুন জানে না?"

সেক্রেটারী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নেতাজী: "আচ্ছা, আমি দেখা করিব। তাহাদের মতলব আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু অবিলম্বে এর যবনিকাপাত হওয়া দরকার।"

সেক্রেটারী: "সশস্ত্র শাস্ত্রী গুপ্তভাবে অন্তরালে অবস্থান করিতেছে—বসিবার ঘরের প্রত্যেক জানালা দরজার আড়ালে।"

নেতাজী সে কথার কোনও জবাব দিলেন না। ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারী করিয়া পোষাকের ঘরে গিয়া আপদমস্তক সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইলেন। দুই পকেটে দুইটি গুলিভরা রিভলবার লইয়া অতি ক্ষিপ্রপদে তিনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কদন্নে পুষ্ট অফিসার দুইটি যেন সারা ভারতবর্ষের লজ্জা ও কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে দাঁড়াইয়া সেক্রেটারি, একজন গুপ্ত পুলিশ অফিসারকে তিনি বলিতেছেন যে এতদিন তিনি নেতাজীর কাছে কাছে আছেন কিন্তু এমন রুদ্র মূর্ত্তি কোনওদিন তাঁহার চোখে পড়ে নাই এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার চেহারার এমন ভয়াবহ পরিবর্ত্তনও কোনওদিন তিনি লক্ষ্য করেন নাই।

নেতাজী ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন—Sit down—"বস"—তাহারা অভিবাদন করিল—কিন্তু বসিল না। নেতাজী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিতেই তাহারা চোখ নামাইল।

গম্ভীর স্বরে নেতাজী বলিলেন—"কি বলিতে চাও—বল?"

...কাপ্টেন বলিল—"আপনার সৈন্যবাহিনীতে যেভাবে কাজকর্ম্ম চলিতেছে তাহাতে মনে হয় আপনারা জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া তাহাদের কাছে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে বিলাইয়া দিতে চান।"

সব জানিয়া শুনিয়াও নেতাজী যেন এই কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার সারা মুখে কে যেন খানিকটা তাজা রক্ত ছিটাইয়া দিল—মনে হইল তাঁহার দুইটি চোখ হইতে যেন রক্ত বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে।

তিনি দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর?"

...কাপ্টেন বলিল—"যে আশা লইয়া আমরা এখানে আসিয়াছিলাম সে আশা আমাদের ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা ছাড়া আপনার গুপ্তচর বিভাগ আমাদের উপর কড়া নজর রাখিয়াছে,—লজ্জার কথা!

নেতাজী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—

"তাহা আমি জানি। কিন্তু তুমি বারবার তোমার ডান দিকের পকেটে হাত দিতেছ কেন? তুমি কি জান না যে সর্ব্বাধিনায়কের সঙ্গে দেখা করিবার সময় নিরস্ত্র হইয়া আসিতে হয়? আগে তোমার পকেটের রিভলভার আমার টেবিলের উপর রাখ—তাহারপর অন্যকথা।" ক্যাপ্টেন থতমত খাইয়া গেল।

দুই পকেট হইতে দুইটি রিভলবার বাহির করিয়া সে নেতাজীর সম্মুখে রাখিয়া দিল। তাহারপর আবার বলিল—"কিন্তু আপনার কার্য্যকলাপ ভারতবর্ষের কল্যাণের পরিপন্থী।"

নেতাজীর কণ্ঠস্বর অতি ধীর ও গম্ভীর হইয়া আসিল; তিনি বলিলেন—

"ওঃ! সেইজন্যই কি তোমরা আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ? আচ্ছা বেশ, এই নাও আমার নিজের রিভলবার, আমাকে গুলী কর। তোমাদের অভিসন্ধি আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম কিন্তু যদি শুধরাইয়া যাও এই আশায় তোমাদের স্থান দিয়াছিলাম—তাহার প্রতিশোধ লও।"

নেতাজীর কণ্ঠে এবার বজ্রগর্জ্জন শুনা গেল—"কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক" ("Coward, Traitor")।

বীর পুঙ্গব দুইটি তখন ভয়ে কাঁপিতেছে—হাত জোড় করিয়া বলিল "নেতাজী আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা অপরাধ স্বীকার করিতেছি।"

নেতাজী তৎক্ষণাৎ "সুইসাইড স্কোয়াড্" বা আত্মঘাতী বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে ডাকিয়া অতি সাধারণ পোষাক পরাইয়া তাহাদিগকে অবিলম্বে—বর্ম্মা সীমান্ত ছাড়াইয়া দিবার আদেশ দিলেন।

তাহারা নতজানু হইয়া আবার ক্ষমা ভিক্ষা করিল। নেতাজী ক্ষমা করিলেন।

ডাক্তার ভদ্রলোক হাসপাতালে দুস্থের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিছুদিন পরেই ব্রিটিশ বম্বারের আক্রোশে শ্লিটট্রেঞ্চের কাছে মৃত্যু বরণ করিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতকার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন কিন্তু আর একজন,—যে বীরপুঙ্গবটি নেতাজীকে হত্যা করিতে গিয়াছিল—তাহার বিশ্বাসঘাতকতা ইম্ফালের কর্দ্দমাক্ত পথে জাতির দুরপনেয় কলঙ্ক হইয়াই রহিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ছাউনির উপর অতর্কিতে ব্রিটিশ বম্বারের অজস্র বোমা বর্ষণ হইয়া গেল। হতাহতের সংখ্যার অবধি নাই। কাহারও নাকের ডগাটা নাই, কাহারও হাত নাই, কাহারও পায়ের নীচের দিকটা নাই, কাহারও বুকে গভীর ক্ষত,—এক একজনের বীভৎস চেহারা দেখিলে ভয় হয়—করুণা হয়—দেশের মুক্তি কামনায় ইহাদের এই অমানুষিক যন্ত্রণা যেন অপরের বুক চাপিয়া ধরে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এম্বুলেন্স কোরের ব্যস্ততা, চারিদিকে যন্ত্রণার মর্ম্মভেদী চিৎকার, যাহারা অক্ষত আছে, বাঁচিয়া আছে, তাহাদের মুখে কথা নাই—ঝান্সীরাণী বাহিনীর মেয়েদের চোখে জল, চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাউনিময় একটা অস্ফুট কাতরতা সেদিনের রাত্রির অন্ধকারে অসহ্য মনে হইতে লাগিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র হাসপাতালে প্রত্যেক আহতদের নিকটে গিয়া দেখাশুনা করিতেছেন। ডাক্তারেরা তটস্থ,—তটস্থ আরও এই জন্য যে কোথায় আঘাত লাগিলে কি ভাবে ব্যাণ্ডেজ করিতে হয়—কি রকম "শক্" (Shock) লাগিলে কোন ঔষধ বা ইনজেকসন দিতে হয়—কেমন করিয়া শোয়াইয়া রাখিতে হয়, কেমন করিয়া শুশ্রূষা করিতে হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানা ছিল নেতাজীর। ভুল করিলে ভর্ৎসনার অবধি থাকে না।

একজন আহতের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন নেতাজী,—ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিতেছে—নার্স সাহায্য করিতেছে। চারিদিকের আর্ত্তধ্বনিতে কান পাতা যায় না।

বম্বিং হইয়া যাওয়ার পরই—শত্রুর সৈন্য সমাবেশের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল, তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী সৈন্যবাহিনীর কাছে বেতারবার্ত্তা পাঠাইতে হইবে—নূতন করিয়া 'ট্রুপমুভমেণ্ট' বা সৈন্য বাহিনীর অগ্রসর হইবার আদেশ পাঠাইতে হইবে। আজাদহিন্দ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কের স্বাক্ষর ইহাতে প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশ ছিল, যখন তিনি হাসপাতাল পরিদর্শনে ব্যস্ত থাকিবেন, তখন কেহ তাঁহার কাছে অন্য কাজ লইয়া যাইতে পারিবে না। কাজেই কেহ কাছে আগাইতে সাহস করে না। কর্ণেল কিয়ানী বলেন,—"দেবনাথ তুমি যাও" দেবনাথ দাস বলেন "এ দায়িত্ব তোমার, তুমি যাও—"। অবশেষে দেবনাথ দাসকেই নেতাজীর সম্মুখীন হইতে হইল।

দেবনাথ দাস "জয়হিন্দ" বলিয়া সামরিক কায়দায় নেতাজীর সম্মুখে দাঁড়াইতেই গম্ভীর ভাবে নেতাজী বলিলেন—"কী ?"

দেবনাথ দাস বিষয়টি বুঝাইতে যাইবেন—এমন সময় নেতাজী তাঁহার হাত হইতে ফাইল লইয়া মেঝের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।—বলিলেন,—"দেখছ না—মানুষ মরছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে—এখন কি তোমার ফাইল সই করার সময় ? মানুষই যদি মরে গেল—কাদের জন্য ভারতের স্বাধীনতা।"

নেতাজীর দুই চক্ষু ভরা জল। দেবনাথ দাস ফাইল গুটাইয়া লইয়া কিরানীর সহিত বাহিরে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হাসপাতাল পরিদর্শন শেষ করিয়া প্রায় আধঘণ্টা পরে নেতাজী বাহিরে আসিলেন।

স্থির ভাবে তাহাদের দিকে তাকাইয়া নেতাজী বলিলেন—"দেবনাথ, মনে কিছু করোনা—আজ আমার মত দুঃখী কে ? আমার সৈন্যদের এত কষ্ট, এমন যন্ত্রণা আমি আর দেখতে পারি না। দাও, কি কাগজ পত্র আছে, সই করে দিই।"

সই সাবুদ হইয়া গেল—নেতাজী ধীরপদবিক্ষেপে নিজের ক্যাম্পে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু সর্ব্বাধিনায়কের দৃঢ় মনে সেদিন যে নিদারুণ দুঃখ ও সমবেদনা জাগিয়াছিল—তাহা আহত বেদনাতুর মানুষের জন্য। মানুষ সুভাষচন্দ্র হয়ত সেদিন তাঁহার একান্ত দুর্লভ দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রার সময়ও সেই আহত বেদনা-কাতর অসংখ্য মুক্তি ফৌজের স্বপ্নে বারবার জাগিয়া উঠিয়াছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন, হয়ত বা ক্যাম্পের স্বল্প পরিসর বারান্দায় পায়চারী করিয়া সারারাত্রি কাটাইয়া দিয়াছেন। সামরিক সাজপোষাকের নীচেয় সুভাষচন্দ্রের যে দরদী মনটি তাঁহাকে বারবার পূর্ব্ব এসিয়ার রণাঙ্গনে অধীর করিয়া তুলিত তাহার পরিচয় আজ কয়জনই বা রাখে ?

দূর হইতে মনে হইল পথ-চলতি ভিখারী।—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড দিয়া যাইতেছি স্বর্গীয় কিরণ শঙ্কর রায়ের বাড়ীতে—ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেনে ;—সাত আট বছর আগেকার কথা। কাছে আসিয়া চেহারা দেখিয়া মনে হইল, পরণ পরিচ্ছদের অপরিচ্ছন্নতা ও দীনতার পিছনে ইতিহাস আছে।

খুব চেনা-চেনা মনে হইল মুখখানা—কিন্তু দাড়ি গোঁফে ও রুক্ষ চুলে এমন দেখিতে হইয়াছে যে সাহস করিয়া কিছু বলিতে ভরসা পাইলাম না—কিন্তু দাঁড়াইয়া গেলাম সেখানে। আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"সাবিত্রীবাবু না?"—উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার বলিলেন—"মিছিল দেখতে যাচ্ছেন? এইদিক দিয়েই আসবে,—না?" বলিলাম—"কিসের মিছিল?—আমি ত জানিনা কিছু—কিরণ বাবুর বাড়ী যাচ্ছি।" —"যান যান,—তাঁকে শুদ্ধ নিয়ে মৌলালীর মোড়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন।—দেশবন্ধুর মৃতদেহ দার্জ্জিলিং থেকে এসে পৌছে গেছে,—এই পথ দিয়েই যাবে। কিন্তু সুভাষ বাবু মান্দালয় জেলে—এ মিছিল কেইবা নিয়ে যাবে কেওড়া তলায়—। সুভাষের জেলই দেশবন্ধুর কাল হোল। হবে না? —সুভাষ যে তাঁর চোখের মণি। যা চেয়েছিলেন ঠিক তেমনই পেয়েছিলেন;—সুভাষ, সুভাষ! নাম করতেই যেন বুকটা কেমন করে ওঠে।" সেকি? সেত অনেক দিনের কথা,—ভাবিলাম, বোধহয় মাথার গোলমাল হইয়াছে। গলার আওয়াজ শুনিয়া মনে হইল ফরিদপুর সাতাশী স্ত্রী সংঘের প্রধান উদ্যোক্তা, বাংলা দেশের একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্ম্মী, দেশবন্ধুর পাশে পাশে ঘুরিতেন ভদ্রলোক, দেখিয়াছি।—নামটা মনে হয় রজনী বাবু। বলিলাম, "চলুন, কিরণ বাবুর বাড়ী—?" মাথাটা নীচু করিয়া ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—"সময় কৈ? ৫০টি চরকা কেনা হয়েছে—মায়েরা সব আসবেন—সন্ধ্যাবেলা; আমার কি না থাকলে চলে?" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় থাকেন?"—কথার কোনও উত্তর না দিয়াই টুপিওয়ালাদের গলি দিয়া ধর্ম্মতলার দিকে চলিয়া গেলেন ভদ্রলোক—একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলাম সেইদিকে—নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রাণ-বহ্নি—এখনও উত্তাপ আছে—কিন্তু শিখা নাই, অন্য কোনও স্পষ্ট অনুভূতিও নাই, আছে শুধু সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধুর প্রতি অন্তরের প্রাণঢালা ভালবাসা। মনটা খারাপ হইয়া গেল—সে দিন আর কিরণ বাবুর বাড়ী যাওয়া হইলনা।

জেল খাটিয়া খাটিয়া অস্থিচর্ম্ম অবসার হইয়া নারায়ণ বাবু কলিকাতায় আসিলেন নদীয়া জেলায় কোনও এক পল্লী গ্রাম হইতে। মুড়াগাছার

চণ্ডীপ্রসাদ মুখার্জ্জির সঙ্গে পরিচয় হইল তাঁহার মিশন রোএর অফিসে।—অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, আশ্রয়েরও অভাব কিন্তু নিছক সাহায্য তিনি কিছুতেই লইবেন না কাহারও কাছ হইতে—পরিশ্রমের বিনিময়ে যদি হয়, সে টাকা তিনি হইতে পারেন—। চণ্ডীবাবু ঠিক করিলেন অফিসের ষ্টেসনারী ভদ্রলোক কিনিয়া দিবেন,—কিনিতে তাঁহাদেরত হয়ই—কষ্ট করিয়া বাজার হইতে লইয়া আসার জন্য শতকরা ২০ টাকা তাঁহাকে লইতেই হইবে। এমনি আর দু'একটি অফিস ঠিক করিয়া দিলেন চণ্ডীবাবু; চলিতে লাগিল নারায়ণ বাবুর খাওয়া পরা থাকা, আটপৌরে রকমের। বস্তীর পাশে টিনের একখানা ঘর—সেখানেই থাকেন নারায়ণবাবু—। যেখানেই তিনি যান—কংগ্রেসের কথা উঠিলে, বিশেষ করিয়া সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলে কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুইটি তাঁহার জ্বল জ্বল করিয়া উঠে,—ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন ভুলিয়া যান, ভুলিয়া যান তিনি একজন সামান্য অর্ডার সাপ্লায়ার। কিছু দিন পরে জানিতে পারা গেল তাঁহাকে কাল রোগে ধরিয়াছে;—নারায়ণ বাবুর যক্ষা হইয়াছে। চণ্ডীবাবু সেই টিনের ঘরে গিয়া দেখিলেন যে ভদ্রলোকের কোনও চিকিৎসা নাই, পথ্য নাই একরকম উপবাসেই আছেন—নিজের রোগ সম্পর্কে যেন কোনও খেয়ালই নাই; যেন এমনিই হয়। সহ্য করিবার অভ্যাস যেন তাঁহার রপ্ত হইয়া গিয়াছে। অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াই গিয়াছিলেন চণ্ডীবাবু কিন্তু নারায়ণবাবু হাসিয়া বলিলেন—"না ভাই, সে আমি পারব না;—হাসপাতালে যেতে হ'লে বাড়ীতে ডাক্তার ডেকে অন্ততঃ দু'চারটা ভিজিট দেওয়া দরকার, তাও আমি পারব না,—ইচ্ছাও নাই; প্রদীপ নিবতে চলেছে, নিবতে দাও—"হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন নারায়ণ বাবু—"আচ্ছা ভাই, সুভাষ বাবু বেঁচে আছেন—? যদি জানো, বল,—আমি কাউকে বলব না—। একমাত্র আশা ছিল তাঁরই উপর;—একদিন না একদিন তিনি আসবেনই।" আগ্রহে ও উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"তাহ'লে তিনি বেঁচে নেই?" মনে হইল যেন নারায়ণ বাবুর নিজের বাঁচা মরা আজ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে সুভাষচন্দ্রের উপর—"যদি তিনি আসতেন।" আর কথা বলেন না নারায়ণ বাবু—মলিন শয্যায় পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকেন;— হয়ত বা

অনন্তকাল ধরিয়াই সুভাষচন্দ্রের প্রতীক্ষায়। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া চণ্ডীবাবু ফিরিয়া আসেন নিজের অফিসে,—ভাবেন, কতখানি ভরসা ভদ্রলোকের সুভাষবাবুর উপর,—কি গভীর নির্ভরতা—তিনি আসিলে যেন ভদ্রলোক বাঁচিয়া যাইতেন।

সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে নারায়ণ বাবুর। নির্ব্বান্ধব আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত একটি দেশ-সেবকের তিলে তিলে এইভাবে ফুরাইয়া যাইবার পিছনে ওই একই মর্ম্মান্তিক ইতিহাস। কিন্তু কেউ জানিতেও পারিবে না সে কথা।

কলিকাতা সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে দরজার কাছে ময়লা ছেঁড়া কাপড় ও পাঞ্জাবী পরা একটি লোককে কিছুদিন আগেও দেখা যাইত ;—মাথার চুল লম্বা ও রুক্ষ, জট পাকাইয়া আসিতেছে—গালভরা দাড়ী গোঁফ, চোখ-মুখ টিকলো, উন্নত নাসা, দেখিলে সম্ভ্রম জাগে মনে। সেই দুরবস্থার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় আভিজাত্যের চিহ্ন।—বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখেন ভদ্রলোক আর মৃদু মৃদু হাসেন। ইংরেজি পোষাক-পরা একটি প্রিয়দর্শন যুবক সেক্রেটেরিয়েটে প্রবেশ করিবার পথে সেই ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকাইয়াই একটু থামেন কিন্তু পরক্ষণেই দ্রুত পদে চলিয়া যান সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে।

কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া কয়েক ঘণ্টা পরে আসিয়া যুবকটি দেখিলেন—সেই আধ-পাগলা ভদ্রলোকটি তখনও ঠিক তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছেন সেক্রেটেরিয়েটের লাল বাড়ীটার দিকে—। ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারেন যুবকটি,—কাছে আসিয়ে বলেন—"কি দাদা, চিনতে পারেন?" হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া উত্তর দেন তিনি—"তা আর পারি না রে—কিন্তু যে রকম সাহেব সেজেছিস। চণ্ডীবাবু, তোকে ডাকতে ভরসাই পেলাম না।"—"এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন আপনি?"—জিজ্ঞাসা করেন চণ্ডীবাবু—; উত্তর দেন ভদ্রলোক অঙ্গভঙ্গী করিয়া—"বাহার দেখছি রে, বাহার!"—"কোথায় যাবেন? আসুন আমার গাড়ীতে, নামিয়ে দিয়ে যাবখন।"—কথা শুনিয়াই হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠেন ভদ্রলোক—"না না, না—কারো মোটরে আমি চড়ি না।"—খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া

আস্তে আস্তে বলেন ভদ্রলোক—"সুভাষ ফিরে এলে তা'র মোটরে চ'ড়ে একবার ইন্‌স্‌পেকসনে বের হ'ব। তুই জানিস, সুভাষ বেঁচে আছে কি না? মরেচে—মরেচে—ঠিক মরেচে—যাবার সময় একলা চলে গেল,—হতভাগা!" বলিয়াই ভদ্রলোক কাঁদিয়া ফেলিলেন। হাত ধরিয়া গাড়ীর কাছে টানিয়া লইয়া যাইবেন চণ্ডীবাবু—"ধ্যাত"—বলিয়া হাত ছাড়াইয়া চোট পায়ে চলিয়া যান ভদ্রলোকটি ডালহাউসি স্কোয়ারের দিকে। সে চলার ধরণ দেখিয়া মনে হয়—তিনি অপ্রকৃতিস্থ।

সিঙ্গাপুর পতনের পর জাহাজ হইতে নামিয়াই হুকুম হইল ব্রিটিশ সিপাহিদের উপর—আজাদহিন্দ বাহিনীর তিরিশ হাজার শহীদের রক্তে গড়া শহীদ-স্তম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। পঞ্চাশ জন সৈন্যের মধ্যে আট জন স্যাপার্স;—তারা মাদ্রাজী, গাঁইতি শাবল ধ'রে, তাহারাই ভাঙিবে সেই আত্মত্যাগের মহিমায় পবিত্র শহীদ স্তম্ভ?—যাহার বেদীমূলে প্রথম শুভ্র ফুলের স্তবক সাজাইয়া দিয়া আজাদহিন্দ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষ সামরিক অভিবাদন জানাইয়াছিলেন? সেদিন মানুষ সুভাষচন্দ্রের অন্তর মথিত করিয়া যে অশ্রুধারা সিঙ্গাপুরের মাটি পবিত্র করিয়াছিল সে অশ্রু হয়ত তখন শুকাইয়া গিয়াছে কিন্তু শহীদের রক্তের দাগ তখনও পর্য্যন্ত লাল হইয়া আছে পূর্ব্ব এশিয়ার সমর ক্ষেত্রে।—সেই পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দিবার নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করিল ব্রিটিশের অশিক্ষিত মাদ্রাজী 'সাপার্স',—তাহারা নেতাজীকে চোখে দেখে নাই, শুনিয়াছিল হয়ত তাঁহার অপূর্ব্ব কাহিনী,—হয়ত শুনিয়াছিল, তাহাদেরই দেশের সহস্র সহস্র সন্তান—ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার দুঃসাহসিক অভিযানে এশিয়ার পূর্ব্ব দিগন্তে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। হউক তাহারা ব্রিটিশ সরকারের বেতনভোগী সামান্য সৈনিক, তবু তাহারা ভারতীয়—সেই শহীদ স্তম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা দৃঢ়প্রতীজ্ঞ হইল—এ হুকুম তাহারা কিছুতেই পালন করিবে না। ভারতীয় সন্তানদের স্মৃতি-স্তম্ভে আঘাত করিবে না বলিয়া, তাহারা বাঁকিয়া দাঁড়াইল—। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান

'টমির' (সৈন্য) দল—সে নিষ্ঠুর কাজ শেষ করিল দ্বিধাহীন চিত্তে। কিন্তু আট জন মাদ্রাজী সাপার্স-এর কোর্ট মার্শাল হইল 'কাজীর' বিচারে। কিন্তু তাহাদের মন কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করিয়া লইল তাহারা বীরের মত।

ব্রিটিশ 'ডেসপাচে' তাহাদের নাম লেখা থাকিবে না—হয়ত বিশ্বাস-ঘাতকতা বা অবাধ্যতার অপরাধের কলঙ্ক দিবে ভারতের চির শত্রুরদল। তাহাদের নাম জানিল না দেশের লোক; ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে তাহাদের সেই আকস্মিক অথচ নির্ভীক আত্মদানের কথা লিখিতে ইতিহাসকারও হয়ত ভুলিয়া যাইবে—কিন্তু সে দিনের সেই সামরিক পরিপ্রেক্ষিতে আট জন মাদ্রাজী সিপাহীর নির্ভীক মৃত্যু-বরণ শুধু যে বিস্ময়কর তাহাই নহে—তাহা তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত দেশ-প্রীতির জ্বলন্ত নিদর্শন।

১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ,—তারিখটা ঠিক মনে নাই; আর্য্যসমাজ হলে সুভাষচন্দ্র নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সারা বাংলার তরুণদের আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"আমি আপনাদের আহ্বান করছি বাংলার আনন্দ উৎসবের মধ্যে নয়, সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নয়, বিত্তমানের মধ্যে নয়, শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে নয়, আমি আপনাদের আহ্বান করছি, দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্য্যাতনের মধ্যে; অভাব অজ্ঞানতা অবসাদের মধ্যে; অত্যাচার অবিচার অনাচারের মধ্যে; সবার উপর মনুষ্যত্বের পদে পদে লাঞ্ছনার মধ্যে। * * * একবার ধ্যান-নেত্রে চেয়ে দেখুন, চারি দিকে ধ্বংসের স্তূপীভূত ভস্মরাশির উপর এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। * * * * শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড়-কুন্তলা, নদীমেখলা, নীলাম্বর-পরিধানা, বরাভয়-বিধায়িনী সর্ব্বাণী সদা-হাস্যময়ী—সেই ত আমার জননী—জন্মভূমি! শারদ জ্যোৎস্না-মৌলি-মালিনী, শরদিন্দু-নিভাননা, অসুরদর্প-খর্ব্বকারিণী মহাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী আজ আমার হৃদয়-পাদপীঠে তাঁর অলক্তরাগ-রঞ্জিত পা দু'খানি রেখে বলছেন—মা ভৈঃ—জাগৃহি।"

পরাধীন দেশের পরিবেশে—দুর্য্যোগের পটভূমিতে বাংলা দেশের তরুণদের আহ্বান করিয়া মাতৃমন্ত্রের উপাসক সুভাষচন্দ্র সেই তরুণ বয়সে জননী জন্মভূমির যে রূপ কল্পনা করিলেন—তাহার প্রকাশ-ভঙ্গীটি সম্পূর্ণ সাহিত্যিক। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দীক্ষা যাঁহার কাছ হইতে হইয়াছিল বাংলা ও ভারতের অবিসম্বাদী রাষ্ট্রনেতা হইলেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন 'সাগর-সঙ্গীত"এর কবি চিত্তরঞ্জন। তাঁহার চিন্তা ও ভাবুকতা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মননশীলতা যে মূলতঃ কাব্যধর্ম্মী ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—তাঁহার কাব্যরচনা ও বাগ্মিতায়। আচারে, ব্যবহারে ও ভাবাদর্শে যেমন তিনি ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব, তেমনি ছিলেন তিনি একজন রসবেত্তা দরদী কবি। তাঁহার প্রধানতম শিষ্য সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক দীক্ষার পর কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে গুরুর আন্তরিক সম্বন্ধের মধুর স্পর্শ পাইয়া থাকিতেও পারেন কিন্তু বিচারের দিক্ হইতে তাহা খুব বড় কথা নয়, কারণ, সাহিত্যের প্রতি সত্যকার দরদ ও প্রীতি মানুষের সহজাত গুণ,—তাহা কোনও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কাহারও অন্তরের গভীরে প্রবেশ করিয়া স্থায়ী হইতে পারে না। কাজেই উপরের উদ্ধৃতি হইতে আমাদের পক্ষে ইহা বুঝিতে পারা সহজ যে, সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক নেতা হইলেও, তাঁহার জীবনের প্রধানতম উপজীব্য বা সাধ্য ভারতবর্ষের রাজনীতি হইলেও তাঁহার গুরু চিত্তরঞ্জনের মতই তাঁহার অন্তরে সাহিত্যের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

"His literary attainments were of a very high order and literature was his first love in life. His acquaintance with both Bengali and English literature was profound. Long before he distinguished himself in the domain of practical politics he had made his mark as a Bengali poet. ("Sagar Sangeet"—songs of the ocean is regarded as one of the best poetical productions. It has been translated into English by Sri Aurobinda Ghosh.) He gathered round him a band of poets, writers and aesthetes who felt that all was not well with Rabindranath Tagore's school of literature and he had sponsored a monthly magazine "Narayan" as opposed to the "Sabuj Patra" of the Rabindranath school. * *

"The "Narayan" school wanted to supply corrective by turning to the indigenous soil for material and inspiration. Attention was drawn to the rich Vaishnava literature of Bengal which blossomed as early as the 16th century A. D. Material was culled, as in the novels of Sarat Chandra Chatterjee, not merely from the life of the bourgeoisie, but also from the life of the neglected village-folk and the indigent peasautry."

সাহিত্যিক ও কবি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে এই উক্তি পাঠ করিয়া সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যের পরিচয় ও সম্পর্ক যে কত গভীর ছিল তাহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে আমরা সুভাষচন্দ্রকে সাহিত্য-সমালোচকরূপে দেখিতে পাইলাম। শুধু তাহাই নহে—লেখক হিসাবে তাঁহাকে বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে তাঁহার রচনার ভঙ্গী ও আবেদন, ভাব-প্রকাশের ভাষা ও বিন্যাস-পদ্ধতি এমনি একটি সুন্দর, সহজ ও সাবলীল পথ ধরিয়া চলিয়াছে যে, তাঁহাকে মনে-প্রাণে সাহিত্যিক বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না—এ কথাটা বাংলা রচনা সম্পর্কে ত খাটেই—ইংরাজি রচনার ত কথাই নাই—যেমন ধরা যাউক, আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়করূপে পূর্ব্ব এশিয়ায় তাঁহার সমর-আহ্বানের কথা :—

"There, there in the distance—beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills, lies the promised land, the soil from which we sprang—the land to which we shall now return.

"Hark ! India is calling, India's Metropolis Delhi is calling, three-hundred and eighty-eight millions of our countrymen are calling, Blood is calling blood. Get up, we have no time to lose. Take up your arms, there in front of you is the road that our pioneers have built. We shall march along that road. We shall curve our way through the enemy's ranks, or if God wills, we shall die a martyr's death. And in our last sleep we shall kiss the

road that will bring our army to Delhi. The road to Delhi is the road to freedom. Chalo—Delhi !"

অথবা—

"The soil has been sprinkled with our blood. The very air is sanctified by the breath of our dying heroes."

"We should have but one desire today—the desire to die so that India may live—the desire to face a martyr's death, so that the path of freedom may be paved with the martyr's blood. Friends, my Comrades in the war of liberation, today, I demand of you, one thing above all. I demand of you—blood. It is blood alone that can avenge the blood that the enemy has spilt. It is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood and I promise you freedom."

যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাধিনায়করূপে হিটলার, মুসোলিনী বা চার্চ্চিলের ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত সমর-আহ্বানের সঙ্গে নেতাজী সুভাষের উপরে উদ্ধৃত আহ্বান তুলনায় অনেক বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ ও সুকথিত এবং যদি পূর্ব্ব-এশিয়ার সমগ্র পরিবেশের কথা ভাবা যায় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইতিপূর্ব্বে এমন ওজস্বিনী ভাষায় সুরচিত আহ্বানের কথা লিখিত হয় নাই। ইহার মধ্যে যে উন্মাদনাপূর্ণ আবেদন আছে, যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকিলেও তাহার রচনার আঙ্গিকটা কিন্তু সম্পূর্ণ সাহিত্যিক এবং আমরা মনে করি যে যাহার সাহিত্যের প্রতি দরদ আছে, প্রীতি আছে, সাহিত্যে যাহার অধিকার ও অভিনিবেশ আছে, সাহিত্য-রসের পূর্ণ উপলব্ধি যাহার অন্তরে আছে—সাহিত্যিক মন লইয়া কলম লইয়া তিনিই বক্তব্য বিষয়কে সাহিত্য রচনার পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারেন। সুভাষচন্দ্রকে সাহিত্যিক বলিয়া অভিহিত করিতে আমরা চাহি না—কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ও অন্তরের যোগাযোগ না থাকিলে তাঁহার মুখ হইতে কখনও এমন সুললিত ভাষায় ও বাচন-ভঙ্গীতে এ প্রকার বাণী বাহির হইত না।

তরুণদের আহ্বান করিয়া সুভাষচন্দ্র যে ভাষণ দিয়াছিলেন—তাহার মধ্য হইতে আর একটি উদাহরণ আমি দিতে চাই সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক মন ও তাঁহার রচনার মধ্যে সাহিত্যসুলভ ভাষা ও ভাবের পরিচয় দিবার জন্য :—

"আজ পৃথিবীর সমস্ত আলো, সমস্ত বাতাস থেকে আমাদের প্রাণে সেই অফুরন্ত সঙ্গীতের আনন্দ-ধ্বনি আসছে; আমাদের বুকের মধ্যে আবেগের উল্লাস-নৃত্য আজ সেই সুরের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। * * * আমার মনে হয় এই আনন্দই আমার জাতির আনন্দ, আমার নারায়ণের আনন্দ। তিনি কোন ওপার থেকে আনন্দে আজ এক সোনার সুতায় কাটনা কেটে আসছেন —যা' আজ রবির কিরণ হয়ে গাছের শ্যামলতায় চিকমিকিয়ে উঠছে,—ভরা নদীর উচ্ছ্বসিত জলে শতধা বিভক্ত হয়ে আনন্দ-স্রোতে ভেসে চলেছে; আবার সেই সোনার সুতাই যেন আজ আমাদের হাতের রাঙা রাখী হয়ে, আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে—ভোগীর সঙ্গে ত্যাগীকে, প্রবীণের সঙ্গে নবীনকে, কর্ম্মীর সঙ্গে ভাবুককে। এই সুরের জাল যখন সমগ্র দেশকে বেড়ে ফেলবে, তখন আজকার এই পুণ্য দিনের ভরসার কিরণ-সম্পাত আসন্ন ভবিষ্যতের সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে—আর তখন যিনি ওপারে, দ্যুলোকে আকাশের চরকায় আলোকের সুতা কাটছেন, এবং ভূলোকে কালের চরকায় কত বিভিন্ন জাতির বিচিত্র ইতিহাসের স্বর্ণ-সূত্র গ্রথিত করে চলেছেন— তাঁকে আমরা পরম বিষ্ণু বলে নয়—জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে বরণ করে নেব।"

দেশবন্ধু সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—

"Against the dawn of 1921, there now stood not merely a whole-time politician but an emancipated soul—a soul reborn. Inspired by a taste of that fulness of life which brings man nearer to divinity and conscious of a higher duty to his nation and to humanity he plunged into the thick of the political strife. His complete renunciation in the cause of the nation roused the affection and gratitude of his countrymen who spontaneously conferred on him the title of "Deshabandhu" or friend of the country."

এই প্রকার ইংরাজী ভাষায় রচনার মধ্যেও সাহিত্যিক প্রাণের স্পর্শ আছে —বিন্যাস-পদ্ধতি এবং প্রকাশ-ভঙ্গীটিও সাহিত্যের মাপকাটিতে যাচাই করা চলে। সুভাষচন্দ্রের অসংখ্য ইংরাজি ও বাংলায় লিখিত প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যেও আমরা এই গুণগুলির সমাবেশ দেখিতে পাই। সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক মন ও প্রেরণা না থাকিলে—তাঁহার "Indian Struggle" বইখানি এমন সুখপাঠ্য না হইয়া তথ্য-সম্বলিত রাজনৈতিক ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইত। পূর্ব্ব এশিয়ায় তিনি যে ভাষায় ও যে ভাব-প্রেরণায় এবং যে বাচন-ভঙ্গীতে দিনের পর দিন সেখানকার নরনারীকে নিজের কাছে আহ্বান করিয়া আনিয়া ছিলেন, তাঁহার অধীন আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীকে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সম্মিলিত করিবার জন্য যে আবেগ-বিহ্বল আবেদন জানাইয়া উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল তাঁহার দরদী সাহিত্যিক মন ও কবিজনসুলভ কোমল-কান্ত হৃদয়ের উন্মাদনা ও ভাবাবেগ। কোনও সৈন্যাধ্যক্ষের পক্ষে ইহা দুর্ব্বলতা নহে—বরং মানুষের মনকে জয় করিবার পক্ষে তাহা একটি দুর্লভ শক্তিবিশেষ। কঠিন ও দুশ্চর্য্য তপস্যার মধ্যে অন্তরের এই দুর্লভ শক্তি ও প্রেরণা তাঁহাকে আনন্দের সন্ধান দিয়াছে—আশা ও উৎসাহে, সাহসে ও বীর্য্যে তাঁহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে। বাংলার সাহিত্য তথা রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে সেই দুর্গম পথে সুভাষচন্দ্রের পরম সান্ত্বনার সামগ্রী ছিল এ কথা মনে করিবার কারণ আছে তাই আমরা দেখি, সমর-শিবিরে শত্রুর আসন্ন আক্রমণ ও বোমা বর্ষণের উপক্রমের মধ্যে "প্রলয় নাচন নাচলে তুমি হে নটরাজ" বলিয়া গান গাহিবার প্রেরণা জাগিয়াছিল সুভাষচন্দ্রের মনে। বাংলা দেশকে যাহারা জানে না, বাঙালীকে যাহারা চিনে না—তাহার চরিত্রের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় নাই, তাহারা বলিবে ইহা ত পাগলামি কিন্তু বাঙালী ইহাতে আশ্চর্য্য হইবে না। সেই প্রেরণা সুভাষচন্দ্রের অন্তরে পূর্ব্বাপর ছিল বলিয়াই গোপীনাথ সাহার ফাঁসির অব্যবহিত পরেই 'ফরওয়ার্ড' অফিসে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি"—রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই কলিটি মধুর সুরে ধ্বনিত হইতে শুনা গিয়াছিল। এটি ছিল তাঁহার সাধনার মূল প্রার্থনা। ইনসিন জেল হইতে কোনও বন্ধুকে তিনি লিখিয়াছিলেন—"জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইয়াছিলাম—তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" মেঘাচ্ছন্ন আকাশে দুর্য্যোগ আসন্ন, পদ্মার খরতরঙ্গে নৌকা চলিয়াছে কোনও এক গ্রামের দিকে—অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে তীরভূমি,—সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে সঙ্গীতের সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"কবে আবার নাচবি শ্যামা, মুণ্ডমালা দুলিয়ে গলে, ওই কালো মেঘের অন্ধকারে, তোর হাতের খড়্গ উঠুক জ্বলে।"—এ প্রেরণা শুধু দেশপ্রেমিক সাধকের অন্তরে শক্তি-সাধনার প্রেরণা নয়—এ প্রেরণা কাব্যধর্ম্মী ভাবুক প্রাণের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, এ প্রেরণা একান্ত ভাবেই মরমী কবির মর্ম্মের প্রেরণা।

সুভাষচন্দ্র সাহিত্য ভালবাসিতেন অন্তর দিয়া তাই তাঁহার চারি পাশে—তিনি বাংলা দেশের বহু নিবন্ধকার কবি, ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিকদের পাইয়াছিলেন অনুরাগী বন্ধুরূপে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যেদিন কংগ্রেস হইতে তাঁহার বহিষ্কারের আদেশ আসে, ঠিক সেইদিন তিনি এমনি অনেকগুলি সাহিত্যিক ও কবি-বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইছিলেন কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়ীতে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা আমরা সকলই জানি। জেলে অনশন ভঙ্গ করাইবার জন্য, আত্মীয় নয়, সহকর্ম্মী নয়, বন্ধু নয়, এমন কি কংগ্রেসী নেতাও নয়, ডাক পড়িল বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী, পথের দাবীর লেখক শরৎচন্দ্রের। কি গভীর স্নেহ ও মমতার চক্ষে শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে দেখিতেন আমরা তাহা জানি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল হইতে ১২ই আগষ্ট, (১৯২৫) তারিখে শরৎচন্দ্রকে চিঠি লিখিতেছেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার 'স্মৃতিকথা' পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। * * *

* * * যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার এই দু'য়ের চাপ পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।" * * * *

আর একখানি চিঠির কিয়দংশ সুভাষচন্দ্রের সাহিত্যিক মনের পরিচয় দেয় :—

"এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় রবি বাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

"সোণার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার * * বিচিত্র রূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।"

এই প্রকার রচনার মধ্যে যেমন গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাই, তেমনি ইহাকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে ফেলিতেও দ্বিধা বোধ হয় না। আমরা জানি, যেমন ইংরাজী সাহিত্যের তেমনি বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন—আমাদের মত সাহিত্য রচনার জন্যই তিনি কোনও দিন প্রবন্ধ,, কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লিখিতে বসেন নাই সত্য, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ছিল, ভালবাসা ছিল বলিয়াই তাঁহার লেখা "তরুণের স্বপ্ন" ও "নূতনের সন্ধান" বই দু'খানির বক্তব্য বিষয়গুলি সাহিত্যিক গুণে সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে তাঁহার বাংলা রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে সাহিত্যিক গুণাবলী তেমন বিকাশ লাভ করে নাই—ভাষার প্রাঞ্জলতা বা ভাবের সাবলীলতাও তেমন দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমশঃ যে তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ হইয়াছে ইহা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ইংরাজি রচনার ত কথাই নাই ;—তিনি পাকা হাতে ইংরেজের মতই রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং সে রচনার মধ্যে সাহিত্যিক মন ও আবেগ-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইত কংগ্রেসের কাজে কিন্তু তিনি ধর্ম, সমাজ ও দেশপ্রীতিমূলক পুস্তকের এবং সাধারণ ভাবে কাব্য, সাহিত্য ও নাটকের কিরূপ নিয়মিত পাঠক ছিলেন—তাহা বুঝিতে পারা যায় দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্ম্মী হরিচরণ বাগচীকে মান্দালয় হইতে লিখিত একখানি চিঠির অংশবিশেষ হইতে। সুভাষচন্দ্র নিম্নলিখিত বইগুলি কর্ম্মীদের নিয়মিত পাঠের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন :—

(ক) ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (২) ব্রহ্মচর্য্য—সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য; ঐ রমেশ চক্রবর্ত্তী; ঐ—ফকিরচন্দ্র দে (৩) স্বামী-শিষ্য সংবাদ—শরৎ চক্রবর্ত্তী (৪) পত্রাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ (৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—স্বামী বিবেকানন্দ; (৬) বক্তৃতাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ; (৭) ভাববার কথা—স্বামী বিবেকানন্দ; (৮) ভারতের সাধনা—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ; (৯) চিকাগো (Chicago) বক্তৃতা—স্বামী বিবেকানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি

(১) দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী (বসুমতি সংস্করণ) (২) বাঙ্গলার রূপ—গিরিজা-শঙ্কর রায়চৌধুরী (৩) বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (৪) নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, রৈবতক ও পলাশীর যুদ্ধ (৫) যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ) (৬) রবিঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী', 'চয়নিকা', গীতাঞ্জলী; 'ঘরে বাইরে'; 'গোরা' (৭) ভূদেব বাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (৮) ডি, এল রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ' (৯) 'ছত্রপতি শিবাজী'—সত্যচরণ শাস্ত্রী (১০) 'শিখের বলিদান'—কুমুদিনী বসু (১১) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' (১২) সত্যেন দত্তের 'কুহু ও কেকা' (কবিতা গ্রন্থ) (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবন চরিত' (১৪) রাজস্থান (বসুমতী সংস্করণ) (১৫) 'নব্য

জাপান'—মন্মথ ঘোষ (১৬) 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'—রজনীকান্ত গুপ্ত (১৭) উপেন বাবুর 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' ও অন্যান্য পুস্তক (১৮) কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস'—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য ৵০ আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী।"

মান্দালয় জেলে বসিয়া এই প্রকার বিশদ ভাবে তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠান—যে কোনও সাহিত্যিক বা বাংলার অধ্যাপকের পক্ষেও খুব সহজসাধ্য নয়। আমাদের বিশ্বাস, আজ যদি সুভাষচন্দ্র এই প্রকার কোনও পুস্তক-তালিকা লিখিতে বসিতেন তাহা হইলে সে তালিকা আরও দীর্ঘ হইত। কারণ পরবর্ত্তী কালে তিনি যে শুধু ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতির বই বেশী পড়িতে আরম্ভ করেন তাহাই নয়—বাঙলা সাহিত্যকে আরও বিশদ ভাবে পড়িবার দায়িত্ব তাঁহার আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন এবং মনে-প্রাণে সে দায়িত্ব পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।

সুভাষচন্দ্রকে সাহিত্যিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা নহে। আমরা পূর্ব্বাপর উদাহর দিয়া এই আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সুভাষচন্দ্রের অন্তরে সাহিত্য-প্রীতিই যে শুধু ছিল তাহাই নহে—সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার গভীর সম্পর্ক ছিল। সাহিত্যের ভাষা, সাহিত্যের ব্যঞ্জনা, বিন্যাস ও ভাবাবেগ যে রচনার সম্পদ, তাহাকে সাহিত্যিক রচনা বলতে কুণ্ঠিত হইবার কোনও কারণ থাকিতে পারে না,—সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য-আলোচনা—সাহিত্য-সৃষ্টির পর্য্যায়ে পড়ে না—এ কথা ঠিক, কিন্তু চিঠি লিখিতে, বক্তৃতা দিতে, প্রবন্ধ লিখিতে সুভাষচন্দ্র সাহিত্যিক ভাষা প্রয়োগ করিতে পারেন বিনা অধ্যবসায়ে; কবি-সুলভ ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রকাশ-ভঙ্গী অবলম্বন করেন সহজে ও অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে—তাঁহার রচনায় ভাষার আড়ষ্টতা নাই, ভাবের অস্পষ্টতা নাই, উপলব্ধির জড়তা নাই; একথা সহজেই স্বীকার করা যায়। আমাদের এই উক্তির সাপক্ষে আমরা সুভাষচন্দ্রের অসংখ্য রচনার মধ্য হইতে নানা বিষয়ক কয়েকটি উদ্‌ধৃতি দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব:

"আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা

শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা, সেইখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।" —(তরুণের স্বপ্ন)

"প্রাতে অথবা অপরাহ্ণে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণকালের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়টি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ বলে পাঠাই—বৈষ্ণবের ভাষায়—

'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা
বহিতে আমার সুখ।'

"সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণ-জালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে, এবং সেই রক্তিম-রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্য্যাস্তের দৃশ্য।" * * *

"প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দ্দায় আঘাত করে বলে—"অন্ধ জাগো"—তখনও মনে পড়ে আর একটি সূর্য্যোদয়ের কথা, যে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিল।"—(মান্দালয় জেল)

সুভাষচন্দ্রের কোনও একখানি চিঠিতে দেখিতে পাই, তাঁহার কবি-সুলভ অন্তরের গভীর মর্ম্মবাণী নিষ্ঠায় ও একাগ্রতায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—

"আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবি বাবুর একটি কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এই জন্য যে, আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন।

তাই বলি,—

এখনো বিহার কল্প জগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্ম্মবাণী।

*　　　*　　　*

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

*　　　*　　　*

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে।

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব
　　　　“পেয়েছি আমার শেষ!
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
　　　　জাগরে সকল দেশ।”

ইহা হইতেই বুঝা যায়, সুভাষচন্দ্রের সহিত সাহিত্যের কি নিবিড় অন্তরঙ্গতা ছিল। সাহিত্য ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রাণ, তিনি তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সাধনার মন্ত্র ও মর্ম্মবাণীকে নানা ভাবে নানা পরিবেশে এমন মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠে সেই মন্ত্র নবতম ছন্দে কবে আবার মন্ত্রিত হইয়া উঠিবে? কবে আবার তাঁহার সেই অগ্নিক্ষরা মর্ম্মবাণী নব জাগ্রত ভারতের বুকে ধ্বনিত হইয়া নব যুগের সূচনা করিবে? —আজ আমরা সেই প্রতীক্ষাই করতেছি।

জয় হিন্দ!